চন্দনডাঙার হাট



স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স  ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২



প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৫

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা বারো আনা

শীতের বিকেলে পশ্চিম আকাশের সিঁদুরে আভা পড়েছে ধান শীষের ওপর। মাঠখানা যেন সিঁদুর মেখে লাল হয়ে আছে। ক্ষেতের সীমানার সামনে মাঝারি জলায় কাঁচের পাতের মত জলে যেন আগুনের আভা। দু'তিনটে ডোবো-নৌকার গলুইয়ের ওপর মাছরাঙা আর স্নাইফ দু'চারটে ওঁৎ পেতে আছে। কানাই হাঁটুজলে নেমে ডোবাটা পার হচ্ছিল—পাখী কটা ওর পায়ের শব্দে উড়ে গিয়ে বসল কাছাকাছি একটা বেত ঝোপের সামনে।

কানাই প্রায় কোমরের কাছাকাছি কাপড় তুলে জলাটা পার হয়ে পৌছল লোচন পণ্ডিতের বাড়ী চন্দনডাঙায়। চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবছা অন্ধকারে দোরের কাছে গিয়ে গলা চেপে ডাকল,—পণ্ডিতমশাই ঘরে আছো?

কানাইয়ের পিছু পিছু আগাগোড়া একটি ছায়ামূর্ত্তি তাকে অনুসরণ করছিল। কানাই যখন পিছু তাকিয়েছিল, ছায়ামূর্তিটা তখন একটি লিচু গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। কানাই পণ্ডিতমশাইকে ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত মানুষটির হাতে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল এক বিঘত চওড়া একখানা টাঙি। লিচুগাছের আড়ালে থেকে ঘুরিয়ে টাঙিটা ছাড়ল কানাইকে লক্ষ্য করে।

লক্ষ্য একটু ভুল হয়ে গেল। বন্‌বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে টাঙিখানা কানাইয়ের গর্দানের বদলে পায়ের মাংস খানিকটা কেটে নিয়ে পড়ল পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ীর বেড়ার পাশে।

—ওরে বাবারে—বাবা গো—বলতে বলতে রোগা বেঁটে কানাইচরণ পণ্ডিতের বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। ছায়ামূর্তিটি বেড়ার কাছে এসে টাঙিখানা কুড়িয়ে নিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে জলার ওপারে।

কানাই ততক্ষণে পণ্ডিতমশাইয়ের ঘরে শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। লোচন পণ্ডিত তার গৃহিণী চন্দ্রা ছুটতে ছুটতে এল,—কি হোল, কি হোল রে কানাই ?

—মরে গেছি পণ্ডিতমশাই। শালারা মেরে ফেলেছে।

—কে মারলে রে, কোথায় ? পণ্ডিত সুতো বাঁধা চশমা পরে দেখতে চেষ্টা করে। চন্দ্রা হারিকেন তুলে তার আগেই দেখে চেঁচিয়ে ওঠে,—ও মাগো ! রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে গা।

কানাইচরণের পায়ের গুলির এক খাবলা মাংস নেই।

লোচন পণ্ডিত দেখে বসে পড়ল। রক্তের দিকে পেছন করে বলল গৃহিণীকে,—এক গ্লাস জল দাও দিকি।

চন্দ্রা আঁচল কোমরে এঁটে পণ্ডিতকে ঘর থেকে বার করে দেয়,—তুমি বাইরে যাও।

ঘরের পাশে গ্যাঁদা গাছের পাতা ছিঁড়ে আনে একমুঠো। পাতা থেঁতো করে কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে বেঁধে দেয় ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে। একটু পরেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

চন্দ্রা রান্নাঘরে গিয়ে একটু দুধ গরম করে এনে কানাইকে দেয় আর গেলাস নিয়ে যায় স্বামীর কাছে। পণ্ডিত দক্ষিণের ঘরে গিয়ে খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে।

—কই ওঠ।

পণ্ডিত চোখ খোলে,—এঁ্যা, বেঁচে আছে ত' ?

—হ্যাঁগো, হ্যাঁ, নাও এই দুধটুকু খেয়ে নাও।

পণ্ডিত উঠে দুধ খেয়ে নেয় এক চুমুকে। আস্তে আস্তে উঠে কানাই যে ঘরে ছিল সেই ঘরে আসে।

দুধ খেয়ে কানাই তখন উঠে বসেছে।

—কি ব্যাপার বল দিকি ? —পণ্ডিত গলার জোর পায় যেন। কানাইয়ের গলা কাঁদো-কাঁদো,—তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার এই দশা।

পণ্ডিত সাহস পেয়েছে,—থাক্ আর ন্যাকা-বোকা সাজতে হবে না। খুলে বলো কি ব্যাপার!

কানাই বলে,—ওই শালারা। ওই যে গো একরামপুরের জোলারা,—শালারা গুপীমুরুব্বির ঘরে জমায়েত হয়েছিল, আজ বিকেলে। আমি ত' সেখানে ছেলুম। ওরা সব শালা বলেছে তোমার রক্ত দিয়ে তাঁত মালিস করবে—যদি তুমি—

পণ্ডিত চমকে উঠল একবার। মুখখানা সাদা হয়ে গেল, পরমুহূর্তেই বললে,——ও! অমনি খুন করলেই হোল কিনা। দোষ আর কারু নেই। ধর্ম্ম নেই! কালই আমি বাবুকে বলে সব শালাকে বাঁশ-ডলা কোরব। কে বলেছে এ কথা?

—ওই পেল্লাদ ব্যাটাই আগে বলেছে।

—কে পেল্লাদ! বাবুর আটকঘর ও কখনও দেখেনি, আচ্ছা!

কানাই আবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে,—তবে আমার কি হবে পণ্ডিতমশাই। বেরোলেই এক-কোপে সাবাড় করে দেবে। ওরা যে টের পেয়েছে আমি তোমাকে খবর দিতে এসেছি।

—তোর ভয় নেই। আজ রাতেই এই ঘরেই থাক। কাল সকালে জমীদার বাড়ী যাব তোকে নিয়ে। পণ্ডিত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

চন্দ্রা সব শুনেছে। পণ্ডিত ঘরে আসতেই বলে, তুমি কি এই নিয়ে বাবুদের কাছে নালিস করতে যাবে নাকি?

—নিশ্চয়ই! ছোটলোক হারামজাদারা কি মাথায় উঠে নাচবে ভেবেছো? ওদের দেখিয়ে দোব—লোচন পণ্ডিতের বেহ্ম-তেজ নষ্ট হয়নি।

চন্দ্রা মুখ টিপে হাসে,—খুব বেহ্ম-তেজ দেখাচ্ছ ত'? তোমারই ত দোষ।

—আমার? কেন, আমার কি দোষ?

—আবার কেন বলছ? গরীব জোলাদের ঠকিয়ে নিজে পয়সা করবে ভাবছ আর তোমার দোষ নয়? কোম্পানীর কাজ করা তোমার চলবে না, কাজ ছেড়ে দাও। সদরে দাদাকে আমি আমি লিখে দিচ্ছি—তোমার কাজ বন্ধ করতে।

—দেখো বেশী চটিয়ো না বলছি। তোমার দাদা আমার কলা করবে। সায়েবের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চন্দ্রা মুখ ভার করে বলে,—তুমি বাবুদের বাড়ী নালিশ জানাতে পারবে না।

লোচন পণ্ডিতের দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী গৃহিনী। বেশী চটাতেও চায় না।

একটু মোলায়েম করে বলে চন্দ্রা—বেশ, যা কোবছ কবো। কিন্তু তোমার ভাল হবে না এতে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি বুঝবখ'ন। একটা পান সাজ দিকি।—পণ্ডিত হাসতে চেষ্টা করে।

২

উদায়স্তের ঘুর্ণিপাকে একরামপুরের দেড়শ তাঁতেব মাকুর একটানা শব্দ আজ যেন মন্থর হয়ে এসেছে। তিনশ নলীব স্থতো বুঝি ক্রমাগত ফুরিয়ে আসছে মাকুর চালনায়। সব স্থতো ধীরে ধীরে ঘন বনাতে মিশে যাচ্ছে তাজ কল্কা, কালা ভোমরা, ফুলঝুমকো অথবা আয়নাখুপী সাড়ীর জমীনে। তবু অন্য দিনের মত তাঁতের ব'গুলো তেমন ওঠানামা করে না। মাকুর খটাখট্ শব্দ কমে আসে যেন।

কানাকানি চলেছে সর্বত্র। আতংকের কানাকানি। এবাব বুঝি সব গেল! হাটে কাপড় বেচতে পাবে না তাঁতিবা। জমিদারের হুকুম।

কিন্তু হুকুম দিলেই ত' হোল না। কতযুগ ধরে তারা এই হাটে বিক্রি করে আসছে। এখনকার জমিদার বাবুর উর্ধতন চতুর্দশ পুরুষ তাদের খাতির করে হাটে বসিয়েছে। আজ এক কথায় বিক্রি করতে দোব না বললেই হোল?

তারা নালিস জানাবে, কিন্তু কার কাছেই বা নালিস জানাবে। শোনা যায় কোম্পানীর হুকুমই তামিল করেছে জমীদার মোটা অংকের নজরানার বিনিময়ে।

থাকত নবাব বাহাদুর! ছখানা নয়নসুখ রোমাল আর একখানা মলমল ভেট নিয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে সায়েস্তা হয়ে যেত জমীদার।

একরামপুরের জোলারা ত' আজকের মানুষ নয়। ওই যে সড়কের ওপর চন্দন ডাঙার পশ্চিম সীমানায় বট গাছটা। ওটার বয়েস আব তাঁতিদের বসতি সমান সমান। প্রায় আড়াইশ' বছর হয়ে গেল। বট গাছটিকে তাইত ওরা দেবতার সম্মান দেয়। বছরের প্রথমে চার জোড়া চৌখুপী সাড়ী সিঁদুর মাখিয়ে পুজো হয়—বট আর পাকুড়ের। বলি হয় ভেড়া আব পাঁঠা। চার ঢোলের বাজনায় ক্ষেতের দিগন্ত পর্য্যন্ত বাতাস কাঁপে। আব শোনা যায় চীৎকার। জোয়ান জোলাদের চীৎকার, বৌ-ঝিদের উলু। তেলে আর সিঁদুরে বটের গোড়াটা রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সে তেলসিঁদুর একবছরের বর্ষায় গরমেও ধুয়ে যায় না।

একরামপুরের সধবা বিধবা সব মেয়েরাই প্রায় সুতো কাটে,—চরকায়, টেকোয। এদের ভেতর সেরা কাটুনী নীরজাবালা। এক তোলা সুতো কাটতে তার দুদিনের বেশী লাগে না। শুধু কি তাই, বাইশ বছরে এই বিধবা নীরুকে পাড়ায ভয করে না, এমন মানুষ নেই বললেই চলে। হাতে সুতো কাটে আব মুখে কট্‌কটানী—দুটো সমান বেগে চলে। অনেক সময ঝগড়া করবার জন্যে তাকে ডেকে নিয়ে যায় অনেক মুখচোরা বধুরা। নীরজাবালার সংসারে কেউ নেই এক অপদার্থ ভাই ছাড়া। ভাই গাবুকে দিয়ে কোন কাজ হবার জো' নেই। একরকম করতে বললে সে আর এক রকম করবেই। নীরজাবালার সুতো কাটা রোজগারেই তাকে খেতে হয়। টাকায় তিন তোলা সুতো বেচে সংসার বেশ চলে যায় নীরুর। শুধু কি নীরুর? একরামপুরের আশে পাশে গাঁয়েরও অনেক অনাথা বিধবার দিন চলে সুতো কেটে।

তুলো বেচতে আসে ব্যাপারীরা হাটে। হাট থেকে কিনিয়ে আনে সবাই। নীরু কিনিয়ে আনে প্রহ্লাদকে দিয়ে। প্রহ্লাদ জোলা থাকে নীরু কাটুনীর ঘরের পাশে। নীরু ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা, তবু—প্রহ্লাদ ওকে দু' চোখ ভরে দেখতে চায়!

একরামপুরের জোলাদের মোড়ল গুপীনাথ বিপত্নীক। ভাইয়ের বউ ছেলেপুলে নিয়ে তার সংসার। ভাই নেই। ভাইয়ের দু' ছেলে মাধাই আর গদাই। গদাই মাধাই দুজনই মোটা—বুদ্ধিও মোটা। তাঁত টানতে টানতেই কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ে নিজেরাই টের পায় না। পাশের বাড়ীর টুকু এসে নাকে খড়কে দিলে, তবে হাঁচি,—চক্ষু উন্মীলন,—জাগরণ। টুকুকে দেখে গদাইয়ের চোখ দুটো হাঁচি খেয়েও ভিজে আসে। টুকু কিন্তু হাসতে হাসতে পালায়,—মাসীগো,—বলতে বলতে গদাই মাধাইয়ের বিধবা মায়ের কাছে।

গদাই পাশের তাঁতে দেখে মাধাই নেই। দাবা পিটতে গেছে কানাইয়ের বাড়ী। সেই রোগা বেঁটে কানাই। গদাই একটু হাই তুলে চটাপট দুটো তুড়ি মেরে কানাইয়ের বাড়ীর দিকে এলো। কানাইয়ের বউ আজ কাঁঠাল খাওয়াবে—সঙ্গে ক্ষীর আর মুড়ি। কানাই মানুষটা বড ভাল। গদাই বড় ভালবাসে ওকে—মাধাইও। কিন্তু জ্যাঠা গুপীনাথ ওকে দু' চক্ষে দেখতে পারে না। গুপীনাথ কযেকবার ওদের সাবধান করে দিয়েছে—ছোঁড়াটা ভাল নয়, মিশো না ওর সঙ্গে।

তাঁতিদের বিপদে আপদে গুপীনাথ বুক পেতে দেয়—বুকে জড়িয়ে ধরে কোন তাঁতিকে তার সাফল্যে। বলে, এরা ছাড়া আর আমার কে আছে? জীবন এদের জন্যেই—মৃত্যুও। জমীদার, ব্যাপারী, বাবু চাষী সকলের সঙ্গেই গুপীনাথ কথা বলবে তাঁতিদের তরফ থেকে। সে যা বলবে—তাই হবে। একটু নডচড় হবার উপায় নেই।

মোড়ল গুপীনাথের একটা কথায় দেড়শ তেলেপাকা লাঠি নিয়ে সামনে দাঁড়াবে দেড়শ ঘর তাঁতি। তার একটা কথায় তাঁতের মাটির বেদী প্রণাম করে বুনে দিতে পারবে কুড়ি গণ্ডা কাপড়। আবার দিনের পর দিন তাঁত বন্ধ করে বসে থাকতেও পারবে তার একটা হুকুমে। গুপীনাথ যেন ওদের রাজা। গুপীনাথ কিন্তু ভাবে সে তাদের চাকর। প্রতিদিন দুপুরে সন্ধ্যায় দুবার টহল দিয়ে আসে সমস্ত গ্রামটা, একটা ছোট মোটা লাঠি হাতে নিয়ে। কোথায় কার বিপদ। কোথায় কে খেতে পেলো না, কে কোথায় অসুখে পড়েছে,

সব খোঁজ নিয়ে বাড়ী এসে ভাত খায়। তার আগে জলগ্রহণ করবে না সে। এমনি করেই চুয়ান্নটা বছর কেটে গেছে তার।

কিন্তু আজ? আজ পাংশু মুখে সেও বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠছে—মাটির বেদী যেন ভেঙে পড়ছে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বালির প্রাসাদের মত, মাকুর, লোহা বাঁধান ধারালো কোন দুটোয় বুঝিবা, মরচে ধরে গেল। এও কি সম্ভব। গুপীনাথের ঘোলাটে চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে। আজকে সবাই আসবে তার বাড়ী এখনি। একটা ব্যবস্থা এর করতেই হবে।

সবাই এলো ঠিকই। সবাই। এমন কি নীরু পর্য্যন্ত ঘরের দরজার আড়ালে। গুপীনাথের গলা কাঁপে' বলে সকলের সামনে,—তোরা ত' জানিস, জমীদারবাবু হাটে কাপড় বেচতে দেবে না আমাদের। চন্দনডাঙার কাছাকাছি আর কোন হাটও আমাদের নেই। থাকলেও গাড়ী ভাড়া করে সেখানে কাপড় নিয়ে গিয়ে কাপড় বেচে খরচা উঠবে না। ধরনা, যদি সনকাপুরের হাটেই যাওয়া যায়। সেত কম দূর নয়,—কি বলিস?

গুপীনাথ থামে—স্তিমিত চোখ মাটীর দিকে রেখে।

বলে মনোহর। গুপীনাথের পরই তার মান্য। তাই সে বলে,—সনকাপুরের হাট! সেত প্রায় সাত আট কোশ হবে! তাছাড়া অত কাপড় বয়ে নেবার গাড়ীঘোড়া কই। ব্যাপারীরা আমাদের কাছ থেকে কিনে ঘোড়ার পিঠে বস্তা নিয়ে যায় দেশবিদেশে। অত ঘোড়া আমরা পাব কোথায়। সে হবে না।

তবে? —গুপীনাথ একটু থেমে বলে,—লোচন পণ্ডিতকে সব কাপড় বাঁধা দামে বেচতে হবে জমিদারবাবুর হুকুম।

কত দরে? একটু আস্তে বলে প্রহ্লাদ।

আমরা যে দরে বেচি তার অর্ধেক দরে। দুটাকা আট আনা দরে চাদর ধুতি আর দুটাকা দশ আনা দরে শাড়ী! চৌরঙ্গী, তাসখুপী, খড়কেমুটি এসব শাড়ী অবিশ্যি তিন টাকা বার আনায়। মলমল মসলীন দশ টাকা দরে দিতে হবে।

সবাই বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে ওঠে।

মনোহর বলে,—এ দরে আমরা পারব না।

—তবে করবি কি? দিতে হবে। রাজার হুকুম!

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কোন পথ দেখতে পায় না সামনে।

মনোহর বলে ধীরে ধীরে,—লোচনপণ্ডিত সে কাপড় নিয়ে কোথায় বেচবে?

গুপীনাথ চিন্তিত হয়ে বলে,—তাইত বুঝতে পারলুম না। তবে শুনলুম লোচনপণ্ডিত কোম্পানীকে দেবে, আর কোম্পানী সাতসমুদ্দুর তেরনদী পার করে পরীর দেশে চালান করবে মলমল, মস্‌লীন থান।

পরীর দেশে! আবার বিস্ময়।

হ্যাঁ, পরীর দেশে। সেখানকার কিছু মানুষ এখানে এসেছে। দেখে এসেছে প্রহ্লাদ সদর থেকে। সবাই প্রহ্লাদের দিকে তাকায়।

প্রহ্লাদ অত লোকের সামনে ভাল করে কথা বলতে পারে না; তবু বলতে চেষ্টা করে, উঃ—সে কি গায়ের রঙ—দুধে আলতা! কি চেহারা! ইরে বাপ্‌! সে একেবারে যেন ইয়ে—!

নীরু একটা পান গালে দিয়ে দোরের পাশ থেকে আর একটু বেরিয়ে আসতে চায়, প্রহ্লাদের কাহিনী শুনতে। প্রহ্লাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য করে চলে যায় আবার অন্দরে।

গুপীনাথ বলে,—তবে কি করবি তোরা—বল!

ভোজবাজীওলা খোঁড়া নীলকেষ্ট কিছু বলতে এগোয় এবার। তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, কোন জিনিষ ফুস্‌ মন্তর ফুস্‌ করে উড়িয়ে দেয়া, আর দুটো থানকে আটটা থান করা! যখন তখন মুরগীর ডিম পাড়িয়ে দেয়া, এসবে নীলকেষ্ট ভোজরাজের সমকক্ষ। লোকে বলে, ভোজরাজ স্বয়ং নাকি ওকে স্বপ্নে ভোজবাজী শিখিয়েছেন। নীলকেষ্টও তাই বলতে চায়। মিটিমিটি হেসে খোঁড়া পা'টা একটু নেংচে হাত উঠিয়ে বলে, জয় ভোজরাজের জয়! খোঁড়া নীলকেষ্টও কাপড় বোনে, আবার দরকার হলে বাটী চালান, ভূতশুদ্ধি করে ঘরের চারপাশে সরষেপড়া ছড়িয়ে দিয়েও দু'পয়সা পায়।

নীলকেষ্ট ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে যেন দম নিয়ে বলে,—একটা কাজ করতে পারলে সব ঠিক হয়ে যায়।

সবাই জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় ওর দিকে।

ও বলে,—পণ্ডিতকে শেষ করে দিন।

সবাই আর একবার চমকে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়—বাইরের লোক কেউ নেই ত?

মনোহর ধীরকণ্ঠে বলে,—আমাদের যে ভাবে মারবার চেষ্টা করছে, তাকে আমরা জ্যান্ত রাখব না—আমারও তাই মত।

সবাই ক্রমে সপ্তমে ওঠে,—ওর রক্তে আমাদের তাঁত ধুয়ে দোব।

গুপীনাথ প্রহ্লাদকে ইসারায় কাছে ডাকে। সবাই বোঝে প্রহ্লাদের ওপরই ভার পড়ল। ওর সুগঠিত পেশীবহুল দেহখানার দিকে তাকিয়ে অনেকের চোখ টাটায়। গুপীনাথ কিন্তু সবচেয়ে ভালবাসে প্রহ্লাদকে।

রোগা বেঁটে কানাই সব শুনে সাদা হয়ে যায়,—শুধোয় গলায় জোর দিয়ে, তাহলে কি করে পণ্ডিতকে ইয়ে—।

কথা শেষ করবার আগেই গুপীনাথের রাগান্বিত জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে ওকে চুপ করে যেতে হয়। গুপীনাথ বোধহয় একটা মতলব টের পায়। প্রহ্লাদকে ডেকে কাণে কাণে কি কথা বলে উঠে পড়ে আজ তোরা ঘরে চলে যা। যা করবার আমিই এবার করব।

সবাই ঘরের দিকে এগোয়। কিন্তু বেঁটে কানাই এগোয় চন্দনডাঙার দিকে লোচন পণ্ডিতকে খবর দিতে। কানাই লক্ষ্য করেনি যে প্রহ্লাদ একখানা টাঙি হাতে নিয়ে ওর পেছনে ছায়ার মত অনুসরণ করছে।

৩

কানাইকে নিয়ে লোচন পণ্ডিত তখনও জমিদারবাবুর কাছারীতে বসেই ছিল। বাহান্নবাতির ঝাড় লণ্ঠনের নীচে কাশ্মিরী কল্কার কাজ করা ফরাস, মোটা মোটা গোটা ছয়েক তাকিয়া, প্রত্যেকটার ওপরেই জরীর বড় বড় পদ্মের কাজ। ওপরে হাতটানা পাখা আর নীচে মাদুর পাতা প্রজাদের বসবার স্থান। মাদুরের ওপরই বসেছিল পণ্ডিতমশাই কানাইকে পাশে নিয়ে। জমিদারবাবু তখনও নীচে নামেনি। হয়ত বা ঘুমই ভাঙেনি। ভররাত নবাবী বাঈজীর নুপুরনিক্কন আর লাল আপেলের মত গালের ওপর সুর্মা আঁকা চোখের ইসারা; গজল আর কাওয়ালী সারেঙী আর তানপুরা ;—হুইস্কির সুতীব্র ঝাঁজ আর ঝাল মাংসের কাবাব।—বহুদিন ধরেই এই চলেছে রাতের পর রাত।

বহুদিন ধরেই এই হুইস্কি আর বাঈজীয়ের পিছনে ঢেলে দেবার মত টাকা জুটে যাচ্ছিল। সম্প্রতি টাকায় টান পড়ল। বাঈজী বললে, আমার ছোট বোনকে আনতে পারেন রাজপুতানা থেকে, ওখানকার মহারাজের পোষ্য হয়ে আছে।

জমিদার তথাস্তু বললেও খাজাঞ্চির হিসাবে টাকায় কম পড়ে। আট হাজার লাগবে তাকে রাজপুতানার মহারাজের কবলচ্যুত করতে। টাকা চাই-ই।

জমীদার হুকুম করে বসলেন আবার হুইস্কির বোতল নিয়ে।

এই সুযোগের সুব্যবহার করতে পারলো কোম্পানীর গোমস্তা লোচন পণ্ডিত। লোচন পণ্ডিতের সঙ্গে কোম্পানীর ডাট্‌সন্‌ সায়েবের সঙ্গে কথা পাকা হোল। একরামপুরের মলমল মস্‌লীন শাড়ী ধুতি কোম্পানীর গুদামে জমা দিতে হবে, যত রূপেয়া লাগে এতে লাগুক।

মিঃ ডাট্‌সন্‌ চিঠি দিলো লোচন পণ্ডিতের মারফত জমিদারকে, আপনার একরামপুরের প্রজাদের সব তাঁতের কাপড় সব আমাকে দিতে হবে, এজন্যে হাটে আপনি যে নজরানা পেতেন, তার ডবল নজরানা দিতে প্রস্তুত আছি। হাটে

তাঁতিদের কাছ থেকে আপনার মাসিক নজরানা আদায়ের একটা হিসাব যদি দেন, তবে তার দ্বিগুন টাকা পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।

লোচন পণ্ডিত বললে,—সায়েব, জমীদার যদি বানিয়ে একটা মোটা অঙ্কের মিথ্যা নজরানার কথা তোমাকে জানায়?

কোম্পানীর ঝানু কর্ম্মচারীদের অন্যতম মিঃ ডাট্‌সন্ কটা গোঁপের ফাঁক দিয়ে হলদে দাঁত দু' চারটে বার করে, বলে,—মিথ্যে করে বাড়িয়ে লিখুক সেইটেই ত আমি চাই।

হোলও তাই। জমীদার উত্তর দিলে—পাঁচহাজার পাই আমি হাটে তাঁতিদের কাছ থেকে।

সত্যি সত্যিই আর পাঁচ হাজার টাকা পেতো না।

ডাট্‌সন্ দশ হাজার টাকা পাঠালে পণ্ডিতের সঙ্গে কোম্পানীর বন্দুকধারী দুজন সিপাই সঙ্গে দিয়ে।

জমীদারকে রসিদ দিতে হোল। চুক্তিপত্রে সই করতে হোল যে একরামপুরের তাঁতিদের সব কাপড়ই দিতে হবে কোম্পানীকে তাদের গোমস্তা লোচন পণ্ডিতের মারফত।

সই নিয়ে সিপাই সমেত লোচন চলে গেল।

একরামপুরের কপাল ভাঙল।

রাজপুতানা থেকে এলো সেই বাঈজী ভগ্নী রূপযৌবনের আশ্চর্য্য রসসম্ভার নিয়ে। আবার নতুন করে নুপুর বেজে উঠল সারেঙী আর তবলার তালে তালে। জমীদারবাবু রাতের পর রাত ডুবে গেল বাঈজীর যৌবন মাদলসা চোখের গভীরে। বোতলের পর বোতল হুইস্কি ফুরোল—আবার এলো। আবার ফুরোল—আবার এলো। কিন্তু একরামপুরের দেড়শ তাঁতির যে ঐশ্বর্য আজ চলে গেল। তা কি আর ফিরে আসবে!

আজও হুইস্কির নেশা এখনও কাটেনি জমীদারবাবুর। পণ্ডিত বসেই আছে কানাইকে নিয়ে। বেলা অনেক হোল। প্রায় দ্বিপ্রহরে একবার দরবার কক্ষে আসবার সময় পেলো জমীদার। মখমলের ওপর জরীর ফুলতোলা চটি পায়ে

পাতলা ধুতি আর একটা ফতুয়া গায়ে। টুকটুকে লাল দোহারা চেহারা। আয়ত চোখদুটোয় তখনও নেশার গোলাপী আভা চলে যায়নি।

লোচন পণ্ডিত দণ্ডবৎ হয়ে উঠে বসে, কানাইও। জমিদারবাবু পণ্ডিতকে দেখে একটু মৃদু হেসে শুধোয়,—কি খবর হে? সায়েব ভাল আছেন?

আজ্ঞে হুজুর, ভাল আছেন। কিন্তু আমি যে মরে যাই হুজুর!

জমীদার চন্দ্রকান্ত একটা তাকিয়া ঠেঁস দিয়ে বসে। আলবোলার নলটা পুরু গোলাপী ঠোঁটে আলতো করে ছুঁয়ে প্রশ্ন করে,—কেন?

চোখের কোণদুটো মুছে পণ্ডিত গলাটাকে অকস্মাৎ কাঁদো কাঁদো করে ফেলে, কালকেইত হুজুর খুন করেছিল আমায় আর একটু হলে। আলটপ্‌কা কেনোর গায়ে আমার বদলে লাগল বলেই আজ গলাটা আস্ত দেখছেন। এই দেখুন হুজুর কেনোর পায়ের গুলীর মাংস একথাবা উপড়ে গেছে টাঙির ঘায়ে।

কানাই মুখনীচু ফেট্টিবাঁধা পা'টা বাড়িয়ে দেয়। জমীদার চন্দ্রকান্ত আলবোলার ধোঁয়া টানতে থাকে। মৃদু মৃদু ধোঁয়া আসে সুবাসিত তাম্রকুটের নাক মুখের ফাঁকে ফাঁকে। চন্দ্রকান্তর ঈষৎ রক্তাভ চোখদুটো আরও রাঙা হয়ে আসে। যদিও এরকম একটা কিছু আশা করা গিয়েছিলো। একরামপুরের দেড়শ তাঁতির অন্ন সংস্থানের আর শিল্পের মূলে সে যে আঘাত করেছে, তার প্রতি আঘাত যে আসবে তা সে জানত। কিন্তু লোচন পণ্ডিতের ওপর সেটা আসবে এ ধারণা করতে পারেনি চন্দ্রকান্ত। তাঁতিদেরই বা কি দোষ। তারই বা কি দোষ। গহরজান বাঈকে তার চাই, তাই টাকা তার প্রয়োজন। তাঁতিদেরও তাঁত বাঁচানো প্রয়োজন। মৃদু মৃদু ধোঁয়ার ফাঁকে হাসে জমীদার চন্দ্রকান্ত। অকস্মাৎ মনের এক পর্দায় ভেসে ওঠে, দেড়শ' তাঁতি আর তার মাঝখানে পিঙ্গল চক্ষু কুটিল খাস ইংরাজ বেনিয়া ডাট্‌সনের মুখখানা। ডাট্‌সন্ পাইপটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে হাসছে—কুৎসিত হাসি।

পণ্ডিতের কথা কিছু কিছু কাণে যায় জমীদার চন্দ্রকান্তর,—ওরা সবাই শলা করেছে হুজুর আমার রক্তে তাঁত ধুয়ে ফেলবে। কেনো সাক্ষী হুজুর···ওই গোপীনাথ—ওই শালাই।

জমীদার চন্দ্রকান্ত আর একবার তাকায় পণ্ডিতের দিকে নীরবে।

—কিছু বিচার করবেন না হুজুর? সায়েব ত' আপনার হাতেই আমায় সঁপে দিয়ে গেছে। সত্যিই ভাটসন্ লিখেছিল, আমাদের গোমস্তা শ্রীপদ্মলোচন ভট্টর সঙ্গে তাঁতিদের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষে আশাকরি মাননীয় জমীদার মহাশয় আমাদের গোমস্তাকে রক্ষা করিবেন।

এ চুক্তিতে স্বাক্ষর আছে চন্দ্রকান্তর।

চন্দ্রকান্ত বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি অনুভব করে অকস্মাৎ। একটা হাঁই তুলে বলে,—ভালকথা লোচন, তুমি দিন পাঁচেক পরে একবার এসো। সায়েবের কাছে আমার একটি চিঠি পৌছে দিতে হবে।

যে আঁজ্ঞে! পণ্ডিত আর একবার অনুনয় করে,—আমার একটা বিচার করে বিহিত করলেন না হুজুর?

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর স্বরে বলে,—কি করতে হবে?

লোচন পণ্ডিত স্পষ্ট বলেই ফেলে,—ওদের যদি একটু শাসিয়ে দিতেন হুজুর!

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বলে'—ওকে মেরেছে কে? কি নাম বললে?

—পেহ্লাদ হুজুব—পেহ্লাদ!

খানসামাকে হুকুম হয়,—ঘোষালকে ডেকে দাও।

কিছুক্ষণের ভেতর খাজাঞ্চির ঘর থেকে প্রৌঢ় প্রশান্ত অনন্ত ঘোষাল আসে। অনন্ত ঘোষাল জমীদারী দেখাশোনা করে থাকে। চন্দ্রকান্ত হুকুম দেয়,—একরামপুরের প্রহ্লাদ তাঁতিকে বেঁধে এনে কয়েদ করে রাখো। পাঁচদিন পর ওদের মোড়লকে আসতে বোল আমার কাছে।

অনন্ত ঘোষাল তাকায় একবার লোচন পণ্ডিতের দিকে। বেরিয়ে যায় তারপর পাইক পাঠাতে একরামপুরে। প্রহ্লাদ তাঁতিকে বেঁধে নিয়ে আসতে।

চন্দ্রনাথ ওঠে—যাবার সময় বলে যায় আর একবার পণ্ডিতকে,—পাঁচদিন পর এসো বিচার হবে।

চলে যায় চন্দ্রনাথ।

পণ্ডিত হুকুমে বিগলিত হয়ে কানাইকে নিয়ে বেরিয়ে আসে জমীদার প্রাসাদ থেকে।

কানাইয়ের মুখ কিন্তু শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, পণ্ডিতকে বলে,—কিঁন্তু আমার যে আর পেরান থাকবে না পণ্ডিত মশাই ?

—কেন ?

—এরপর কি আর একরামপুরে ইস্তিরি নিয়ে থাকতে পারব ?

পণ্ডিত মুখিয়ে ওঠে, তবে বেটাছেলে হয়েছিলি কেন ? নাকি কান্না কাঁদছিস্ ? কানাইও একটু চটে,—তুমি আর কি বুঝবে ? পেহ্লাদকে কয়েদ করলে কি আর গাঁয়ে থাকা যাবে। তুমি ত আছ চন্দনডাঙার জমিদার বাবুর আঁওতায় !

—যা, যা, বেশী বক্‌বক্ করিসনি।

কানাই নাছোড়বান্দা,—বলে, তোমার বাড়ীতে একখানা ঘর দাও। ইস্তিরিকে নিয়ে আসি।

পণ্ডিত হন্‌হন্ করে হাঁটে,—তার চেয়ে বলনা নাড়ু দাও।

কানাই পায়ের যন্ত্রনায় জোরে হাঁটতে পারে না। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে পিছিয়ে পড়ে।

সড়কের বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ কি যেন ভাবে কানাই। রৌদ্রতপ্ত সড়কের ধূলায় ওর চোখমুখ পুড়ে যায় যেন। বটের তলায় তুটো বাচ্চা পাঁঠা লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে। সেখানে বসে পড়ে কানাই।

সড়কেব তুদিকে ক্ষেত। হলুদ সরষে ফুলের ওপর প্রখর রৌদ্রের আভা পড়ে ক্ষেতখানা যেন তেজে জীবন্ত মনে হয়। তার ওপারে ধান ক্ষেতের ছোট ছোট সবুজ পাতা,—তারও পরে কাদা আর জল, বিলের মত অনেকটা জমি, সীমানায় ঘন নিবিড় গাছের মেলা স্বর্ণচাপাটি গা—ওর ভেতর ছায়ায় লুকিয়ে আছে রোদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে,—ওপরে আকাশ চক্‌চকে কাঁচের মত মেঘহীন।

বসে বসে জিরোয় কানাই। একটু দূরে মাদার গাছে পাখীর বাসা ভাঙতে বেরিয়েছে তুটো নেংটিপরা কালো ছেলে। বোধহয় কোন চাষীর ছেলে হবে। একটা ছেলের পায়ে ফুটেছে মাদারের কাঁটা। আর একটা ছেলে কাঁটা বেঁধা

ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে দেখায়, উই তাল গাছের ওপর ঝুলছে প্রায় গোটা ছয়েক বাবুইয়ের বাসা। ভারী মজা ত'! খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলেটা একটা ঢেলা ছোঁড়ে তাল গাছের মাথা তাক করে। বৃথা। বেশীদূর উঠল না। খানিক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে ছেলেদুটো চলে যায় ক্ষেতের আল ধরে।

কানাই এবার ওঠে। কোন রকমে পা টেনে টেনে এগোতে থাকে ও ঠিক করেছে যাবে সিদে গুপীমোড়লের বাড়ী। সব বলবে কেঁদে। গুপীমোড়ল যদি বা একটু ইতিউতি করে। গদাই মাধাই ত' তাকে ভালবাসে। ওরা তাকে বাঁচাতে পারবে। যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করে কানাই।

মোড়লের বাড়ী গিয়ে গুপীমোড়লের দেখা পায় না কানাই। মোটা গদাই ঝিমোচ্ছিল তাঁতের সামনে বসে। ওকে ডাকে কানাই।

ভাই মরিচি!

চোখ দুটো কচলে গদাই একটু যেন বিস্মিত হয়েই বলে,—কেন কি হোল?

মারা পড়েছি ভাই। বাঁচাও আমাকে! মেধো কোথায়?

কানাইয়ের চোখমুখ দেখে, পায়ে ফেট্টি দেখে গদাই ভড়কে যায়। চেঁচিয়ে মাধাইকে ডাকতে যায়। কানাই বারণ করে,—চেঁচাসনি ভাই। ভেতরে গিয়ে ডেকে নে' আয়।

গদাই ভেতরে গিয়ে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা মাধাইকে ডেকে আনে। কানাই বলে,—চ' আমার বাড়ী চ' সব বলছি।

গদাই আর মাধাই তক্ষুনী কানাইয়ের সঙ্গে ওর বাড়ীর দিকে চলে। কানাই জানে মোড়লের ভাইপো গদাই মাধাই সঙ্গে থাকলে গাঁয়ে কেউ তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে না।

প্রহ্লাদ সকালে নিশ্চিন্ত মনে বসে বাঁখারী চেঁছে বাগানের বেড়া করছিল। কলা বাগানের বেড়া। ঘরের পিছনে দুটো পেঁপেগাছ আর কলাগাছের একটি ঝাড় উঠেছে। গতকাল কোথাকার দুটো গরু এসে একটা কলাগাছ মুড়িয়ে খেয়ে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তাই আজ বেড়ার আয়োজন। বাগানের পাশ দিয়েই সরু রাস্তা। রাস্তায় বসে বাঁকারীগুলো চেঁছে পরিষ্কার করে জড় করে রাখছিল ও।

কাঁখে কলসী আর হাতে বালতী নিয়ে ইতিমধ্যেই নীরুর আবির্ভাব। নীরু গিয়েছিল পানাঘাটে। স্নান সেরে জল নিয়ে আসতে আসতে বাধা পেলো প্রহ্লাদের সামনে। সে রাস্তাটা জুড়ে বসে আছে।

কেমন বেআক্কেলে মানুষ গা! রাস্তা মেপে গতর জুড়ে বসেছো। সরো।

প্রহ্লাদ চমকে ফিরে তাকায়, অ নীরু। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে নীরুর গালের ওপর। ভিজে শাড়ী দোভাজ করে লেপটে আছে তার সর্বাংগে। দেখতে খুব ভাল লাগে। ভাল ত' আজ থেকে লাগে না, বহুকাল আগে থেকেই ভাল লাগে।

প্রহ্লাদ তখন একেবারেই ছেলেমানুষ আর নীরু এক ফোঁটা মেয়ে। পাশাপাশি ঘর। তাই তার আর নীরুর বাপ প্রায় ঠিক করেই রেখেছিল যে ওদের বিয়ে দেবে। এমন ত' কতই ঠিক থাকে; কিন্তু বিয়ে ত' সকলের হয় না। নীরুরও হোল না। দোষটা প্রহ্লাদের বাপেরই। নীরুর বাপ তাঁতি হয়েও তাঁত ছেড়ে জমীদার বাড়ী কাজ করে সংসার চালাত এটা সইতে পারত না প্রহ্লাদের বাবা। যে তাঁতি তাঁত ছাড়ে তার সমাজ ছাড়বারই বা বাকী কি?

অতএব নীরুর বিয়ে হোল পাঁচ ছ' খানা গ্রাম পেরিয়ে এক হাভাতের ঘরে। কেউ নেই কুলে। শুধু এক ছেলেই আছে বলতে গেলে, সেও কাজ করত জমীদার

বাড়ীতেই। বিয়ের পর বছর না ঘুরতেই ছেলেটা মারা গেল—জ্বর অতিসারে। নীরু অভিভাবকহীনা হয়ে শ্বশুরবাড়ী আর রইল না। এল বাপের কাছে।

প্রহ্লাদের বাপও মারা গেল। প্রহ্লাদের বিয়ে করা আর হোল না। করলও না। নীরু বিধবা হয়ে আসবার পর দু'একজনের মুখে মুখে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল নীরুকে ও আবার বিয়ে করতে রাজী আছে। জোলাদের ঘরে এমন হামেশাই হয়ে থাকে। কিন্তু নীরুর বাপ এবার শোধ নিলে—বললে, বিয়ে আর দেব না।

কালে কালে নীরুর বাপও মারা গেল। নীরু একা পড়ল বাচ্চা গবেট ভাইটাকে নিয়ে। কি করে খাওয়ায়? কিই বা করে।

প্রহ্লাদই এলো উপযাচক হয়ে। এক কাজ কর না নীরু। সুতো কাট তুই, বিক্রি করে দেব আমি। আমারই ত তাঁতে বটেশ্বরের দয়ায় অনেক সুতো লাগে। যা টাকা পাবি তোদের চলে যাবে।

নীরু অসহায় চোখ দুটো তুলে প্রহ্লাদের দিকে তাকায়,—বাবা ত' তাঁতের কাজ করত না। চরকা টেকো পাব কোথায়?

আমি এনে দোব। তুই ভাবিসনি নীরু—অত বড় জোয়ান মরদ প্রহ্লাদের গলাটা একটু কেঁপে ওঠে। নীরুর অসহায় দৃষ্টি ও সইতে পারে না।

নীরু চোখ নীচু করে—টসটস করে জল পড়ে ওর চোখ দিয়ে।

প্রহ্লাদ দেখতে পারে না নীরুর কান্না। নীরু গালাগাল করলে খুব ভাল লাগে ছোট বেলা থেকেই। কিন্তু কাঁদবে কেন? মহামুস্কিলে পড়ে গেল প্রহ্লাদ। তাড়াতাড়ি পালাল সেখান থেকে। পরদিন চরকা টেকো তুলো কিনে পৌঁছে দিলে নীরুর ঘরে।

সেই থেকে নীরু সুতো কাটে। এখন সে গ্রামের নামকরা কাটুনী। তার রোজগারে অতি সহজেই ভাইবোনের চলে যায়। উপরন্তু দু'পয়সা জমাতেও পেরেছে ও।

প্রহ্লাদ তবু আজও গালাগালি খায় নীরুর কাছে। ইচ্ছে করেই অনেকটা। নীরুর এই ঝগড়া করবার সময় হাত নাড়া, চোখ ডাগর করা, চুল খুলে পড়া, আঁচল খসে পড়া—এসব, বড় ভাল লাগে তার। ভারি আনন্দ লাগে। খুব প্রাণ

খুলে হাসে। নীরু যত বকে, ও তত হাসে। যতক্ষণ না নীরু ওর একটা অতি দুর্বল জায়গায় ঘা' দেয়, তুমি কি গায়ের জোরে আমায় ভয় দেখিয়ে কিছু করতে চাও?

কথাটা বড় বিশ্রী লাগে প্রহ্লাদের। ওর মুখখানা অকস্মাৎ শুকিয়ে যায়। জোর ত' সে কখনও করেনি। গ্রামের আর সবাই হয়ত তার গায়ের জোরকে ভয় করতে পারে! কিন্তু তাই বলে নীরুও ভয় করবে সকলের মত?

মনটা বড় দমে যায়। ও জানে যে নীরু ওকে ঘৃণা করে হয়ত বা। দেখতে কালো। কুৎসিৎ। নীরু সুন্দর। তাকে ছোটবেলা থেকেই নীরু কালো বলে রাগাত। ছোটবেলায় তাকে কালো বললেই নীরুর পিঠে কীল বসাত। নীরুও জেদী মেয়ে—ও কালো ছাড়া ওকে অন্য নামে কিছুতেই ডাকত না। এখনও তাইই ডাকে।

তবু সে আজও ওকে দিনে একবার অন্তত না দেখলে থাকতে পারে না। ওর ঘরে গেলে নীরু এখনও হয়ত বলে বসে,—কালোর আবার কি মতলব?

ভাষার শ্লেষটা সে বোকা হলেও ধরতে পারে। কিছুনা এমনি—বলতে বলতে মুখ কাঁচুমাচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নিশ্চিত ভাবে আর যাবে না, কিন্তু আবার যায়।

আজ বেশ জব্দ হয়েছে নীরু। প্রহ্লাদ ওকে আর যেতে দেবে না। সরবে না রাস্তা থেকে। নীরুর চোখ মুখ কিন্তু রাঙা হয়ে ওঠে। কাঁখে ঘড়া হাতে বালতী নিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে ও আবার বলে,—কই সরো। কালা-হাবা নাকি?

প্রহ্লাদ উত্তর না দিয়ে বাঁখারী চাঁছে।

বারে! কই! এবার কিন্তু চেঁচাব বলছি।

প্রহ্লাদ ওর রাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আবার কাজে মন দেয়।

নীরু ক্রমেই রাগতে থাকে,—কি তামাসা হচ্ছে নাকি? রাস্তায় বসে তামাসা? সত্যি চেঁচাব?

তবু সে সরে না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীরুর হাত ব্যথা হয়ে আসে,—আমাকে কি গাঁয়ে টিকতে দেবে না? তোমার জ্বালায় কি ঘরছাড়া হবো?

প্রায় কেঁদে ফেলে নীরু,—চিরটা কালই ত জ্বালাচ্ছ! তমি মরলে আমি বাঁচি।

প্রহ্লাদ আহত হয়,—আমি মরলে তুই বাঁচিস নীরু?

নিশ্চয় বাঁচি। ভগবানের কাছে মানত করি' তুমি মরো।

আর দ্বিরুক্তি না করে ওকে পথ ছেড়ে দেয়।

বেড়া বাঁধা শেষ করে স্নান করতে যাবে প্রহ্লাদ। তেল মেখে গামছা কাঁধে ফেলেছে। ইতিমধ্যেই শোনা যায় জমীদারের পাইক বরকন্দাজের ডাক,—পেল্লাদ তাঁতি হাজির আছো? বাইরে এসে জমীদারের বরকন্দাজ দেখে মুখ ওর শুকিয়ে যায় মুহূর্ত্তেই। তবু কিছু বলবার আগেই দড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে দুটো পাইক,—তুই পেল্লাদ বসাক?

আজ্ঞে?

ওর হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে বলে, চল রাজার হুকুম।

ওর ঘাড়ে দুটো ধাক্কা মারে জোরে। পড়ে যেতে যেতে কি যেন বলতে যায়, বলতে পারে না। চারপাশে ভীত কৌতূহলী জনতা। শিশুরা ভয়ে এগোয় না। নীরুও গোলমাল শুনে রান্না করতে করতে এসে পড়ে। এসেই দেখে প্রহ্লাদের ঘাড়ে দুটো বেদম চড় মারলে দুটো জোয়ান গুঁপো পাইক। ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল মাথাটা নীরুর। দাওয়ার ওপর বাঁশের খামটা ধরে দাঁড়িয়ে না পড়লে হয়ত বা পড়েই যেত।

নিয়ে গেল ওরা ধরে। যাবার সময় সর্দার পাইক বলে গেল গুপীনাথের বাড়ী, যে গুপীনাথকে ডেকেছে মহারাজ পাঁচদিন পরে তার কাছারীতে। পাঁচদিন পর শনিবার বিকেলে। চলে গেল ওরা।

একরামপুরে সেদিন যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হোল। থমথম্ করছে সমস্ত গ্রামখানা আতংকে আর ভয়ে। কে জানে এর পর আরও কি হয়! কোন শব্দ নেই। দেড়শ তাঁতের, অবিরাম অর্কেষ্ট্রার মত ধ্বনিও আর শোনা গেল না

সেদিন। গরু ভেড়া পাখীগুলোও যেন কিছু বিস্মিত হোল, আতংকিত হোল অস্বাভাবিক স্তব্ধতায়। একরামপুরের তাঁত স্তব্ধ—এও কি সম্ভব ?

সমস্ত দিনটাই শুয়ে রইল নীরু।

রান্না পড়ে রইল।

গবা কিছু খেল, শুধোল,—দিদি খাবিনে ?

না।

কেনরে দিদি ?

নীরু ধমকে উঠল, যা মুখপোড়া, বেরো আমার সামনে থেকে।

বোকা গবা ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝলেও এটা বুঝল যে গুরুতর কিছু একটা হয়েছে এবং সেটা পেল্লাদদা'র জমীদার বাড়ী ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার থেকেই।

দিন গড়িয়ে এলো পশ্চিমের আকাশে। প্রহ্লাদ ফিরল না। তার অতিবৃদ্ধা মা এলো নীরুর কাছে,—এখনও পেল্লাদ এলো না। কি হবে আমার ?

তাকেও ধমকে ওঠে নীরু,—বুড়ী আবার এলো জ্বালাতে। যাও সামনে থেকে যাও।

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে চলে যায়।

নীরুর চোখ বেয়ে জল পড়ে আঁচলে। আঁচল মুখে চাপা দিয়েই শুয়ে আছে ও। নীরুর চোখে জল কেউ কখনও দেখেনি। আজও যেন দেখতে না পায়। সবচেয়ে লেগেছে নীরুর সকালে নিজেরই বলা কথাটা। ভগবানের কাছে মানত করি তুমি মরো। সত্যিই যদি মরে যায়। মেরে ফেলে এরা কালোকে। তবে ত আর কেউ ওকে জ্বালাতে আসবে না দিনের পর দিন। কিন্তু সে যে অসহ্য ! ভাবতেই বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দেয় যেন। ভগবান ওকে ফিরিয়ে এনে দাও।

আরও একবার সে এমনি করে কেঁদে ডেকেছিলো ভগবানকে এই প্রল্লাদের জন্যেই—তখন ওরা খুব ছোট। দুপুরে লুকিয়ে গিয়েছিলো জলার ধারে টিনের একটা ডোঙা নিয়ে। জলার ঠিক মাঝখানটায় শালুক ফুল ফুটেছিলো অনেক।

নীরু জেদ করেছিল তার শালুক ফুল চাই। বেশ চল—টিনের ডোঙাটা জলে একটু গভীরে নামিয়ে উঠল দুজন। নীরু বললে—আমার ভয় করে। নামিয়ে দাও আমায়।

ভীতু কোথাকার।—নীরুকে নামিয়ে দিয়ে একাই উঠল প্রহ্লাদ। দুহাত দিয়ে নীচু হয়ে দুদিকে জল টেনে চলল। কিছুদূর যেতেই টিনের হালকা ডোঙাটা কাগজের নৌকার মত পট করে উল্টে গেল। ডোঙার নীচে ঢুকে গেল প্রহ্লাদ। যদিও সে একটু একটু হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটতে পারত। তবু আর ওঠে না। ক্রমশ নীরুর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কাঁদতে কাঁদতে চেঁচায়—কালো উঠে আয় ও কালো! কালো আর ওঠে না।

এবার বাচ্চা নীরু ভয়ে কাঁদতে থাকে। ভগবান ওকে ফিরিয়ে দাও!

খানিক পরেই প্রহ্লাদ হাঁপাতে হাঁপাতে সাঁতরে চলে আসে। চোখদুটো ওর রাঙা। নীরু তখনও কাঁদছে। কিন্তু আশ্চর্য প্রহ্লাদ উঠে এসেই ওর গালে মারল তিনচারটে চড়, কাঁদচিস কেন, ভীতু কোথাকার!

আজও যদি প্রহ্লাদ এসে নীরুকে এখন ঠাস্‌ঠাস্‌ করে কয়েকটা চড় বসাত আর বলত,—কাঁদছিস কেন, ভীতু কোথাকার! তাহলে—! নীরুর আঁচল আবার ভিজে ওঠে। কি অপরাধ করেছে ও যে বেঁধে দিয়ে গেল ওকে। হয়ত ওরা এতক্ষণ প্রহ্লাদকে কিছুই খেতে দেয়নি। সকাল থেকে খেটে খাবার আগে চান করতে যাবে। ঠিক সেই সময়ই মুখপোড়ারা ধরে নিয়ে গেল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। একরামপুরের ছোট ছোট দোকান কটায় আলো জ্বলে। একটা মুদীর দোকানের সামনেই জটলাটা হচ্ছে। ভোজরাজের বেটা নীলকেষ্ট একটু নেংচে উঠে বলে,—ও আমি জানতুম। ভোজরাজের মহিমেতে আমি জানতে পেরেছি—এ মাসটা পেল্লাদের জিয়ন কাঠি মরণ কাঠি নিয়ে খেলা। বিশ্বেস না হয় দেখিস।

দোকানী হাবা বলে,—এত যদি তোর ভোজরাজের মুরোদ ত' দেনা লোচন পণ্ডিতকে একটা বাণ মেরে। বেটা দিন তিনেকে যাতে গলা দিয়ে রক্ত উঠে সাবাড় হয়ে যায়॥

নীলকেষ্ট চোখটা একটু নাচায়,—পারিনা মনে কচ্ছিস? পারি কিন্তু পয়সা লাগবে। অন্তত ন'সিকে। খরচা কে করবে বল?

হাবা ন'সিকে খরচ শুনে একটু দমে যায় তবু কথার রেশটা ছাড়ে না, বলে,—ন' পয়সা হয়ত দেখ, আমি এখনি দিচ্ছি।

গদাই এলো ইতিমধ্যে,—কি রে, বকর বকর কচ্ছিস?

হাবা বলে,—ভাই ন'সিকে খরচা করতে হবে তোমার, লোচন পণ্ডিতকে বাণ মারা হবে।

গদাই এক গাল থুতু ফেলে মোটা হাতখানা হাবার ঘাড়ে রাখতে রাখতে বলে,—ও বাবাঃ। অত পয়সা কোথা পাব? পেল্লাদটার জন্যে মনটা বড় কেমন কচ্ছে।

—সে কিরে। তোর মনও আবার কেমন করে তা'লে? হাত নাবা ঘাড় থেকে। গদাই হাত নামায়।

দুর্গাকালী বিষণ্ণ মুখে বলে,—পেল্লাদটাকে মেরে-টেরেই ফেলবে না কি কে জানে। একবার ত' শুনেছি একটা প্রজাকে বাবুদের বাড়ীর বাগানের পাঁচীলের ভেতরে জ্যান্ত গেঁথে দেয়া হয়েছিলো।

ক ছিলিম টেনেছিস?—গদাই মোটা হাসে।

হাসছিস মানে, পিসীমা গল্প করেছে। পিসেমশাইয়ের জ্যাঠা মানে পিসীমার শ্বশুরকেই নাকি পুঁতে ফেলেছিলো পাঁচীলের ভেতর। তার দোষের ভেতর সে নাকি বাবুদের বাড়ীর পাশে লাঠি কাঁধে করে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বড়বাবু বেড়াচ্ছিলেন বাগানে। দেখতে পেয়ে বললেন,—কে যায়?

পিসীমার শ্বশুর বুঝতে না পেরে ঠাট্টা করে বলেছিল'—তোর যম। ব্যস রাতে ধরে নিয়ে এসে বড়বাবু রাতা-রাতি পাঁচিলে ওকে গেঁথে ফেলবার হুকুম দিলেন। ওর হাত পা বেঁধে মুখ বেঁধে পাঁচিলের মাঝখানে শুইয়ে চারপাশে ইট দিয়ে গেঁথে দিলে। বাপ্? ভাবলেও কেমন গা' গোলায় যেন। পেল্লাদটাকেও আবার যদি তেমন কিছু করে বসে। ও যেমন কাঠগোঁয়ার।

গদাই পেটের অপ্রয়োজনীয় চর্বি দোলাতে দোলাতে হাসে,—কিছু হবে না। আটক ঘরে থাকবে। তারপর শনিবার দিন খুড়োমশাই যাবে বাবুর কাছে।

আটক ঘর! নীলকেষ্ট চমকে দুপা' লেংচে পিছিয়ে যায় আর সবাই আশ্বস্ত হয় প্রল্লাদ মরবে না জেনে।

নীলকেষ্ট শুধু আর কথা কয় না। দু'দিন ওকে আটক ঘরে থাকতে হয়েছিল। ও জানে 'আটক ঘর' বস্তুটি কি ?

প্রায় বারো বছর আগেকার কথা। তখনও নীলকেষ্ট ভোজরাজের বরপুত্র হয়নি। তখন একবার হাটে হাত ফস্‌কে কেমন ধারা একজনের ট্যাঁকের টাকায় হাতটা চলে গিয়েছিল। ভীড়ের চাপে টাকা কটা ওর হাতে চলেও আসত ; কিন্তু লোকটা টের পেয়ে হঠাৎ চেপে ধরলে ওকে তারপর কিছু প্রহারের পর হাটের গোমস্তা নিয়ে গেল তাকে নায়েব মশায়ের কাছে।

নায়েব মশাই বিচার করে ওকে দুদিন আটকঘরে রাখবার হুকুম দিলেন। ওকে নিয়ে গেল বরকন্দাজরা ধরে বাবুদের বাগানের ভেতর এক একতলা ঘরের সারির কাছে। একটা ঘর খোলা হোল। ঘরটার ভেতর কি ছিল। কিছুই দেখতে পেলো না নীলকেষ্ট। শুধু একটা দুর্গন্ধ বদ্ধ বাতাসে ভেসে এলো। ঠেলে দিলে ওকে সেই ঘরে। ওরে বাপ্‌। তারপর যে কিভাবে ওর দুটো দিন গেছে সে ভগবান ছাড়া আর কেউ জানে না। ইটের দেয়াল কিন্তু মেঝে মাটির। ঠাণ্ডা সাপের গায়ের মত। উচুঁতে একটা মোটে জানালা। জানালার আলো মাটিতে নামে না। বন্ধ ঘরে সবচেয়ে সাংঘাতিক পচা দুর্গন্ধ। ইঁদুর কিংবা ভাত পচা তাই বা কে জানে ?

ঘণ্টা পাঁচেক পরে দুর্গন্ধটা সয়ে যায় কিন্তু তখন জালাতন করে কেঁচো আর কেন্নো। জীবন বেরিয়ে যায় যেন এদের গায়ে পায়ে বেয়ে ওঠবার সুড়সুড়িতে। আটকঘর—মানে বর্তমান সংসারে নরক বলে যদি কিছু থাকে, তবে ওই আটকঘর। ওই ঘরে পেল্লাদকে পাঁচদিন থাকতে হবে!

ল্যাংচা নীলকেষ্ট যেন ঘেমে ওঠে কার্তিকের সন্ধ্যায়।

বলে,—আজ্, চলিরে হাবা।

নীলকেষ্ট আকস্মিক দ্রুতপায়ে চলে যায় সেখানে থেকে—আর সবাই কিছুক্ষণ থমকে থাকে। একটু পরে গদাই চলে যায় বেঁটে কানাইয়ের বাড়ী। তামাক আর দাবা, দুটোই মজুত সেখানে।

সন্ধ্যে উতরে গেছে। দাওয়ার পাশে একটা লোহার ছোট কড়াইয়ে কাঠ জ্বেলে আগুন করে পোয়াচ্ছে কানাই। কার্তিকের শেষে বাইরে বেশ হিম পড়ছে। হাতদুটি তাতিয়ে নিতে নিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে কানাই তাকিয়ে আছে সামনে পেঁপে গাছটার দিকে। নীল আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ দেখা গেছে তখন। কানাই একবার সে দিকে চোখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গদাই এসে হাজির। কানাইকে চমকে দিয়ে বলে,—কি পেঁপে গাছে ভূত দেখছ ?

কানাই হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বলে,—না, একটা কথা ভাবছিলুম। এসো—।

এখানে নয়—গদাই বলে,—ঘরে চলো একচাল মাত করে দিই চলো। কি ভাবছিলে বলোত ?

কিছু নয়। ভাবছিলুম পণ্ডিত শালার কথা। শালা বামুন না হলে ঠিক লাথাতুম ধরে। এমন হারামী বামুন কি করে হোল ভেবে অবাক লাগে।

গদাই শুধোয়—কেন পণ্ডিত আবার কি করেছে ?

কানাই রাগের রেশটা টেনেই বলে,—কি করতে আর বাকী রেখেছে বলো ? ধরো না আমিই ত' শালার জন্যে প্রাণ দিয়ে খাটলুম। শেষকালে কিনা আমায় বলে মরগে যা যেখানে খুসী। ভগবান কি নেই মনে করেছে ? ভাগ্যিস তুমি তোমার খুড়োমশাইকে বলে আমায় বাঁচালে। নইলে ত' গাঁ ছাড়া হতে হোত।

গদাই মোড়ল গুপীনাথকে বলে কয়ে কানাইকে এবারের মত ক্ষমা করিয়েছে। গুপীনাথ কানায়ের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে পণ্ডিতের কাছে আর কখনও যাবে না। এই উপকারের উল্লেখে গদাই একগাল হেসে বলতে যায়,—কি আর করিচি এমন—।

কানাই বিষণ্নমুখে বলে,—মনটা আজ বড় খারাপ। জানতুম পেল্লাদকে ধরে

নিয়ে যাবে। কিন্তু কি সাজা দেবে কে জানে। বড়বাবুর মেজাজ ত' ভাল মনে হোল না।

গদাই বলে,—তুই ত' বললি পাঁচদিন পর ছেড়ে দেবে।

কানাই ভাবতে ভাবতে বলে,—বোধ হয় না। চল এক চাল দাবা বসা যাক।

মোটা গদাই এতক্ষণে যেন একটু ভাবিত হয়ে পড়ে। প্রহ্লাদকে সাজা দেবে। কি সাজা—কেমন সাজা। বড়ই গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে ওর। ওর সোজা মোটা বুদ্ধিতে অত ভাবতে ভাল লাগে না। তবে প্রহ্লাদকে বড় ভালবাসে ওরা সবাই। তাই মনটা এতক্ষণে ওর বড় খারাপ লাগে। বলে,—বাড়ী যাই আজ।

বলে বাড়ীর দিকে এগোয়। কানাই তেমনি বসে থাকে। আগুন পোয়াতে থাকে আর ভাবে। কানাইয়ের বউ থাকোমনি ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে শুধোয়,—খেয়ে নেবে নাকি?

তুই খেগে যা! ওর দিকে না তাকিয়েই বলে কানাই।

থাকোমনি আবার গিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ে। ঘুমোতে পেলে থাকোমনি স্বর্গ পায়। সকালে ভাতটা চড়িয়ে একটু ঘুম, দুপুরে চানটা করে একটু ঘুম, খেয়ে একটু ঘুম, সন্ধ্যায় রেঁধে একটু ঘুম—রাত্রে ঘুম।

ফুলো ফুলো গালের চেয়েও ফুলো ফুলো ওর চোক। কানাই ওকে মাঝে মাঝে ডাকে,—ঘুমন্তি!

থাকোমনি রাগে না, একটু ঘা দিয়ে বলে,—ছ'বছরে কোলে একটা এলোনা, ঘুমোব না ত' কি তোমার পাশে গাটছড়া বেঁধে বসে থাকব?

ছয় বছরে কোলে একটা না আসার দোষও যেন সম্পূর্ণ কানাইয়ের। কানাই আর কথা বলতে পারে না। থাকোমনি নির্বিঘ্নে ঘুমোয়।

গদাই বাড়ী এসে গুপীনাথের ঘরে যায়। গিয়ে শোনে সে তাঁত ঘরে বসে আছে। তাঁতঘর ত' অন্ধকার দেখে এলো সে। তবু মা বলে, তোর খুড়ো তাঁত ঘরেই আছে। একটা আলো নিয়ে তাঁতঘরে এসে দেখে অন্ধকারে গুপীনাথ বসে আছে। মুখটা যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাঁতের 'ব' গুলো এক আধবার আঙুল দিয়ে নাড়ছে। মাটি লেপা বেদীটার ওপর হাত বুলোচ্ছে হয়ত বা একবার।

গদাই কথা বলতে সাহস করে না আজ। একটু কেসে শব্দ করে। কিন্তু গুপীনাথের হুঁস হয় না। সে গভীর ভাবে অন্যমনস্ক। কোন কথা না বলে গদাই চলে যায়। সমস্ত গ্রামখানাই যেন আজ খুড়োমহাশয়ের মুখের মত গম্ভীর। গদাই বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকে।

৫

আজ শনিবার ভোরে জেগে লোচন পণ্ডিত বলে,—দুগ্‌গা—দুগ্‌গা।

দ্বিতীয় পক্ষের চন্দ্রাবতী পাশ থেকে বলে,—কচ্ছপ—কচ্ছপ!

হেঁই!—পণ্ডিত চটে যায়,—অযাত্রা নাম করলে,—রাম-রাম!

বেশ করেছি। আজ যেন তোমার মুখে চুন কালী পড়ে। একটু হায়াও নেই গা! এতগুলো মানুষের ভাত মেরে তোমার ভাত বাড়বে ভেবেছ? কদিন থেকে বলছি এ কাজ ছেড়ে দাও। পুরুতগিরি করে তার চেয়ে একবেলা খাওয়াও ভাল। তা শুনবে কেন? জানে প্রাণে না মরলে ত' আর ছাড়বে না? কি দরকার ছিল তোমার কোট্‌না হয়ে পেহ্লাদ তাঁতির নামে বাবুকে নালিশ করার? শত্তুর বাড়বে বই ত' কমবে না এতে?

পণ্ডিত গম্ভীর স্বরে বলে,—দেখো, এসব ব্যাপারে তুমি নাক গলিও না। এসব তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি।

ছাই বোঝ! চন্দ্রা ফোঁস ফোঁস করে,—মাথায় কিছু ঘি আছে বলে ত' মনে হয় না। চাল কলার পিণ্ডি আছে মাথায়।

পণ্ডিত রেগে আগুন,—চুপ কর। ফের বেশী বক্ বক্ করলে কুরুক্ষেত্র করে দোব।

করোনা কুরুক্ষেত্র,—চন্দ্রা বিছানায় শুয়েই দুলে ওঠে—দুবার—কেমন মুরোদ দেখি। করো। আমিও হাটে হাঁড়ি ভাঙতে জানি। বল্‌ব নাকি গাঁয়ের

লোককে পূজো আর্চা ফেলে সনকাপুরের ঝোঁপের আড়ালে বসে থাকতে এই চন্দরের রূপ দেখতে, একদিন হাত ধরে টেনেছিলে সন্ধ্যের মুখে, চেঁচিয়ে উঠেছিলুম। বলব সবাইকে ? বলব ? আমার বাবার পায়ে ধরে আমায় বিয়ে করে এনেছ। বেশী গলা চড়িও না। চরিত্তির তোমার অনেক আগেই জানা আছে। আমার ভাইকে ধরে ত' এই কাজ পেয়েছ আবার আমার ওপর নবাবী মেজাজ দেখাচ্ছ।

পণ্ডিত যেন মন্ত্রপড়া জলের ছিটেয় কেঁচো হয়ে যায়,—তবুও ফিস্ ফিস্ করে বলে,—তা আর বলবে না! নিজের কেলেংকারীর কথা নিজে ঢাক পেটাবে না? আমি যে কাজ কচ্ছি তোমার ভালর জন্যে করছি। বাডী ঘর জমীজায়গা পাল্‌কী গাডী এসব যদি চাও, তবে আমাব কাজে ব্যাগ্‌ড়া দিও না।

বলে চন্দ্রার থুত্‌নীটা ধরতে যায় পণ্ডিত। শুয়ে শুয়েই চন্দ্রা ওর হাতটা ঝাম্‌টা মেরে সরিয়ে দেয়,—থাক, আর আদর দেখাতে হবে না! বাড়ী পাল্‌কী আমার চাই না, ঝামেলাও আমার চাই না।

পণ্ডিত উঠে পড়ে—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, ওঠ, ওঠ, আর বেলা কোর না। আবার জমীদার বাড়ী যেতে হবে সকাল সকাল।

উঠব না। শুয়ে থাকে চন্দ্রা।

পণ্ডিত উঠে সকালেই স্নান করতে চলে যায়।

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলেও যথা সময় হাজির হয় পণ্ডিত কাছারীতে। গিয়ে দেখে তার আসবার আগেই গুপীনাথ আর মনোহর তাঁতি এসে বসে আছে। নায়েব মশাই এসে দুবার ঘুরে যায়। তৃতীয় বার নাযেব যখন আসে তার পিছনে পিছনে আসে জমীদার চন্দ্রকান্ত। এসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে। গড়গড়াব নলটা পুরু রাঙা ঠোঁটে লাগিয়ে তাকায় সামনের দিকে! গুপীনাথ, মনোহর, লোচন পণ্ডিত হাত জোড় করে বসে আছে। আরও একজন বসে আছে। চন্দ্রকান্ত ইসারায় শুধোয় নায়েবকে এ লোকটা কে ?

নায়েব বলে,—হুজুর, এ লোকটা মহিমপুরের বাবুদের সীমানার ওপার গিয়ে আপনার নামে অকথা কুকথা বলে বেডাচ্ছিল।

হুঁ! গড়গড়ায় নিঃশব্দে গোটা তিনেক টান দিয়ে চন্দ্রকান্ত হাত পাখাটার

দিকে তাকায়। হাত পাখা যে টানছিল, সে লোকটা আরও তাড়াতাড়ি টানতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্যে চন্দ্রকান্তের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে।

নায়েবকে বলে,—লোকটাকে বেঁধে এই সামনের দালানে ফেলে রাখো সমস্ত দিন। বিকেলে ছেড়ে দিও।

মানেটা নায়েব পরিষ্কার বুঝতে পারে। কাছারীর সামনে সিমেণ্টের উঠোনে সমস্ত দিন রোদ পেলে লোকটাকে তেল মাখিয়ে রাখলে ভাজা হয়ে যাবে। বিকেলে হয়ত লোকটাকে দেখা যাবে ভরদিন রৌদ্রতপ্ত সিমেণ্টের তাতে আর মাথার ওপরে সূর্যের তাপে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকবে। জ্ঞান না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী। চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান করে ছেড়ে দিতে হবে সন্ধ্যায়।

নায়েব বাইরে যায়। একটু পরে দুটো পাইক এসে লোকটাকে ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে যায়।

নায়েব আবার ফিরে আসে—এই চিঠিটা—বলে একখানা চিঠি আর কালী সমেত কলমটা জমীদারের দিকে বাড়িয়ে দেয়। জমীদার একটা সই করে দেয় সেখানে। ষ্টেটের শীলমোহর ছাপত' আছেই। একবার শুধু চন্দ্রকান্ত শুধোয়,—পাঁচ হাজার ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।—

চিঠিটা লোচন পণ্ডিতের হাতে দিয়ে নায়েবই বলে দেয়,—ডাট্‌সন্ সাহেবের কাছে চিঠিটা কালই পৌঁছে দিতে। চিঠিতে পাঁচহাজার টাকা চাওয়া হয়েছে ডাট্‌সন্ সাহেবের কাছে। পরিবর্তে চন্দনডাঙার উত্তর সীমান্তে প্রায় পাঁচশো বিঘে জমী দিয়ে দেয়া হবে বলা হয়েছে! এর ভেতরে প্রায় বিশখানি গ্রাম পড়েছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে ডাট্‌সন্ একবার লিখেছিল কিছু জমীর [illegible] তখন চন্দ্রকান্ত দিতে চায়নি। কিন্তু আজ তার টাকার দরকার পড়েছে রাজপুতানার বাঈজী ভগ্নীর নূপুর নিক্কনের কাছে টাকার ঝন্‌ঝন্ শব্দ তুচ্ছ বলেই মনে হয়। জীবনের রসসুধার সন্ধান চায় চন্দ্রকান্ত টাকার বিনিময়ে। টাকা তার চাই।

নায়েব বলে,—তাঁতিদের মোড়লকে কি বলব? ওদের প্রহ্লাদকে আটক রাখা হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত চুপকরেই বসে থাকে। আলবোলা টানতে টানতে চোখদুটো তার স্তিমিত হয়ে আসে। বাঈজী ভগ্নীর বিচিত্র রূপসজ্জায় আর টকটকে রাঙা ঘাগরার আবর্তে ডুবে গেছে তার মন। আর বাঁধা পড়েছে তারপর রামধনু রাঙা কঞ্চুলিকার বন্ধনে।

জমীদার চোখ মেলে,—কি বললে?

নায়েব আবার বলে গুপীনাথের কথা। চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকে আরও। তারপর আড়মোড়া ভেঙে বলে,—শোন মোড়ল। একরামপুরের সমস্ত কাপড় লোচনের ঘরে তুলে দিতে হবে। ব্যতিক্রম হলে—।

আর বলতে হয় না, গুপীনাথ হাত জোড করেই থাকে।

চন্দ্রকান্ত বলে নায়েবকে—লোচনের সঙ্গে পাঁচটা ববকন্দাজ যাবে কাপড় আদায় করতে। কেউ বাধা দিলে তাকে সড়কিতে গেঁথে আমার কাছে আনবে।

একটু থেমে বলে,—ও! সেই লোকটাকে ছেড়ে দাও। বলে দাও এরপর যদি আবার সে কিছু করে, পরিণামে তার প্রাণ দিতে হবে।

নায়েব চলে যায়।

চন্দ্রকান্ত আর কিছুক্ষণ তামাক সেবন করে ওঠে, মখমলের চটি পায় দিতে দিতে লোচনের দিকে তাকিয়ে একবার বলে,—কালই উত্তর আনা চাই সাহেবের।

লোচন পণ্ডিত ভাঁজকরা কাগজটি হাতে নিয়ে চন্দ্রকান্তের চটির ধূলো নিয়ে মাথায় বুকে দেয়। চলে যায় চন্দ্রকান্ত।

পণ্ডিতও একবার গুপীনাথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চলে যায়।

গুপীনাথ আর মনোহর বাইরে এসে দাঁড়ায়। একটু পরে দেখে দুটো পাইক ধরে নিয়ে আসছে প্রহ্লাদকে। হাঁটবার শক্তিও প্রায় প্রহ্লাদের নেই। তবে কি এতদিন না খাইয়ে রেখেছিল?

গুপীনাথের মুখখানা তাঁতের কাঠের মত কালো হয়ে ওঠে।

প্রহ্লাদ সামনে এসে বসে পড়ে। পাইক দুটো চলে যায়।

মনোহর প্রহ্লাদকে ধরে উঠোয়। গুপীনাথের সঙ্গে সঙ্গে মনোহর প্রহ্লাদকে নিয়ে বাইরে আসে। মাঠে একটা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে ওরা।

প্রহ্লাদ হাঁপাতে থাকে। অমন শক্ত সমর্থ ছেলেটা যেন মরতে বসেছে!

খুব মেরেছিল? রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে গুপীনাথ।

কিছু হয়নি আমার। চল গ্রামে চল। বলে আবার হাঁপাতে থাকে প্রহ্লাদ।

গুপীনাথ মনোহরকে একটা গরুর গাড়ী ডাকতে বলে।

গাড়ী কি হবে খুড়ো এমনিই যেতে পারব। —বলতে চায় প্রহ্লাদ।

তুই থাম ছোঁড়া। গুপীনাথ ধমকে ওঠে। ঠিক দুপুরে গরুর গাড়ী থেকে নামে তিনজন একরামপুরে গুপীনাথের বাড়ীর সামনে। প্রহ্লাদকে ধরে নিয়ে গুপীনাথ বাড়ীর ভেতর এগোয়।

গ্রামে কথাটা রটে যায়। গ্রামের তাঁতিরা সবাই ভেঙে পড়ে যেন গুপীনাথের বাড়ী। গদাই মাধাই তাদের চিৎকার করে বাড়ী যেতে বলে আর শুনিয়ে দেয় প্রহ্লাদ ভাল আছে। তবু রাস্থর বউ, মনোহর তাঁতির বাড়ীর সব মেয়েরা, পাশের বাড়ী টুকুদের সব মেয়েরা, মেয়েদের ভীড়েই গুপীনাথের বাড়ী গিজ্‌গিজ্‌ করতে থাকে। সবাই প্রহ্লাদকে একবার চোখে দেখতে চায়। দেখে চমকে ওঠে,—আহা গো, এমন জোয়ান ছেলেটাকে আধমরা করে দিয়েছে।

প্রাণে সকলেরই লাগে—কারণ সকলেই জানে যে তাদের বাঁচাবার জন্যেই প্রহ্লাদের এই দশা।

প্রহ্লাদ এতটা আদর—আহ্লাদ আশা করেনি। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরে সকলকেই একটু হেসে প্রত্যুত্তর দান করে।

গুপীনাথ প্রহ্লাদকে স্নান করিয়ে খাইয়ে বাড়ী রওনা করে তবে খেতে বসে।

তখন পড়ন্ত বেলা।

বাড়ীর ভীড়ও কমে যায়।

প্রহ্লাদ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভাবে, কই গাঁয়ের সব মানুষই ত এলো, কিন্তু একজন এলো না কেন?

গদাই বলে,—দেখিস্ হোঁচট খাবি !—ওর ওপরই প্রহ্লাদকে পৌছে দেবার ভার পড়েছে। সামনে একটা ছোট গর্ত ডিঙিয়ে প্রহ্লাদ আর একটু জোরে পা চালায়। নীরু এলো না একবার দেখতে—এইটেই প্রহ্লাদের মনে বড় বেশী বাধে। সে মরল কি বাঁচল সে খোঁজটা নেবার প্রয়োজনও মনে করে না নীরু ! একটুও কি মায়া থাকতে নেই ! অভিমানে একটু বেসামাল হয়ে পড়ে ও। জোরে চলতে চেষ্টা করে। চোখদুটো ওর হতাশায় ফাঁকা মনে হয়। গাঁয়ের আর কেউ তার খোঁজ নিতে না এসে শুধু মাত্র নীরুও যদি আসত। তাহলে ওর আরও বেশী আনন্দ হোত—এটা ও নিশ্চিতই অনুভব করে। আবার এমনও ত' হতে পারে নীরুর অসুখ হয়েছে। সে হয়ত মিছিমিছি নীরুর ওপর রাগ করছে ! বেশ ত' গিয়েই দেখা যাবে।

বাড়ী গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করে প্রহ্লাদ। গদাইকে বিদায় করে মা কিছু বলবার আগেই ও নীরুর ঘরের দিকে এগোয়। বেলা তখন পড়ে এসেছে। নীরুর ঘরের সামনে গিয়ে একবার উঁকি মারে প্রহ্লাদ। দেখতে পায় নীরু ভাত খাচ্ছে। নীরু ওকে হয়ত বা দেখেছে, কিন্তু দেখেনি বলেই মনে হোল।

প্রহ্লাদ বুকে সাহস নিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। নীরু চোখ তোলে,—প্রথমটায় প্রহ্লাদের চেহারা দেখে একটু থমকে গেলেও মুহূর্তে নীরু বিরক্তি এনে বলে,—আ মরণ ! কালো খুনে আবার কখন এলে ? তুমি মরোনি এখনও। জ্বালাতে এসেছ আবার ! প্রহ্লাদের মুখখানা কালো হয়ে যায়।

বলতে চায়,—আটক ঘরে একদিন থাকলে মরে যাবি তোরা। কি ঘর জানিস ? ও কিছু বলবার আগেই নীরু ঝগড়ার ছুতো পেয়ে বলে,—আমি আটক ঘরে থাকতে যাব কেন ? কথা বলারও কি তোমার ছিরি নেই একটু। চোপরদ্দিন পর চাট্টি ভাত মুখে দিতে বসেছি—এলো কিনা জ্বালাতে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি আমি। এ্যাদ্দিন পর এলুম—তাই—।

—আমায় একেবারে কিনে নিলে ! —নীরু ভাত মুখে তোলে।

প্রহ্লাদ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। মনটা ওর ভারি খারাপ লাগে। আর দিনকতক আটকঘরে থাকলে হয়ত বা সত্যিই সে মরে যেত, মরলেই হয়ত ভাল

হোত। প্রহ্লাদের মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে যায়। ঘরে চলে আসে। নিজের তাঁত ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছোট্ট ঘরের দোরটা খোলা। প্রায় বুক উঁচু ভিটের ওপরে বসে সামনে ফাঁকা মাঠটি চোখে পড়ে। মাঠ আর আকাশের দিকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রহ্লাদ। দূরে দুটো হাটুরে নামগোত্রহীন কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। বেত ঝোপ আর শ্যাওড়া ঝোপ, ধারে ধারে শিয়ালকাঁটা আর ফনীমনসার ছোট ছোট সারি। ডান দিকে ঘাট। ঘাটের কোণে বৃহৎ একটা পলাশগাছ আর পাশে মাঝারি রোগা একটি কৃষ্ণচূড়া। বৈকালিক সূর্যের শেষ রশ্মি ক্রমশই মাঠ থেকে সরে যাচ্ছে। হেমন্তের সন্ধ্যা বড় তাড়াতাড়ি আসে। ক্রমশঃ আবছা হয়ে আসে ঝোপগুলো।

প্রহ্লাদ ওঠে, কিন্তু দেখতে পায় না যে পিছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে নীরুও ওকে দেখছিলো। ভেতরে গিয়ে বুড়ো মায়ের কাছে বসে। মা সুতো কাটছিলো—নীরুও।

সুতো কাটতে কাটতেই মা বকতে থাকে, প্রহ্লাদের উদ্দেশ্যে,—তুই ত বাবা চলে গেলি রাজার বাড়ী। এদিকে এ ছুঁড়ী দিন রাত্তির কেঁদে মরে।

প্রহ্লাদ ঠিক বুঝতে পারে না, কার কথা বলছে।

নীরুও সুতো কাটতে কাটতেই ফোঁস করে ওঠে,—আ মরণ! বুড়ো মাগী চোখে দেখতে পায় না, কি দেখতে কি দেখেছে। কে আবার কাঁদলো লা?

—তুই আবার কে! জানিস বাবা চান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলো এই পাঁচদিন।

নীরুর কান দুটো রাঙা হয়ে ওঠে,—দেখো মিছিমিছি বানিয়ে ছেলের কাছে বোল না বলছি; তুমি চোখের মাথা খেয়ে দেখতে গিয়েছিলে যে আমি উপোস করেছিলুম! চিতেয় ত' চলেছ, যা নয় তাই বলতে ত' এখনও ছাড়ো না দেখছি! যেমন ছেলে তেমনি মা! জ্বালিয়ে দিলে!

প্রহ্লাদ মিটিমিটি হাসে।

নীরুর গালাগালিগুলো মধুময় হয়ে ওঠে ওর কাছে।

৬

দেখতে দেখতে একরামপুরের আশেপাশের সমগ্র অঞ্চলে কাপড়ের দাম দ্বিগুণ বেড়ে গেল। একাল পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে মানুষের পরবার কাপড় জোগাত একরামপুরের জোলারা। ইদানীং একরামপুর জোলাদের কাছ থেকে চুক্তির দামে সমগ্র কাপড় নিচ্ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের গোমস্তা লোচন পণ্ডিতের মারফত। লোচন পণ্ডিত প্রতি সপ্তাহে দুবার জমিদারের বরকন্দাজ নিয়ে টাকা নিয়ে যেত একরামপুরে। সেখান থেকে সমস্ত কাপড়ের গাঁট গরুর গাড়ীতে তুলে নিয়ে আসত চন্দন ডাঙায় ওর ঘরে। প্রতি সপ্তাহে কোম্পানীর ঘোড়ার গাড়ী আসত সদর থেকে। সমস্ত কাপড় তারা নিয়ে যেত সদরে। সেখানে ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি কোরত কোম্পানী সাধারণ মোটা মোটা কাপড় সাড়ীগুলো। আর মলমল, মস্‌লীন এ সব চলে যেত কলকাতায়। সেখান থেকে জাহাজে মসলীন মলমল চলে যেত সাত সমুদ্র পার হয়ে বিলেত দেশে। সেখান থেকে কিছু সূক্ষ্ম বাহারের কাপড় চালান হোত ফরাসী, জার্মানী ও সমগ্র ইউরোপের অন্যান্য দেশে।

ব্যাপারীরা কোম্পানীর কাছে আটপৌরে কাপড় নিয়ে বিক্রি করতে যেত হাটে হাটে! কিন্তু কোম্পানী যে পরিমাণ মুনাফা রেখে ব্যাপারীদের কাছে কাপড় বিক্রি কোরত, তাতে ব্যাপারীরা কম দামে দিতে পারত না। কাপড়ের দাম ফলে হয়ে গেল দ্বিগুণ। কাপড়ের দাম দ্বিগুণ হবার দরুণ অন্যান্য জিনিষের মূল্যও কিছু কিছু বেড়ে চলল। চাষীরা যে দরে ধান বিক্রি করে পূর্বে কাপড় কিনত, এখন সে দরে ধান বিক্রি করলে কাপড় কেনা চলে না। কাজেই ধানের দর বাড়ল। এমনি করে সব জিনিসের দর ক্রমে বেড়ে উঠল। ইংরাজ-বনিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের আর্থিক কাঠামোকে পালটে দিতে স্নুরু কোরল। এই প্রথম ইংরেজের বণিক-বুদ্ধি সমাজে শিকড় চালিয়ে তাকে ছত্রভংগ করে দেবার ষড়যন্ত্র কোরল এই বিরাট ষড়যন্ত্র ও শাসনের প্রথম বলি হোল দেশের তাঁতিরা।

একরামপুরের নির্বিঘ্ন জীবনে ছন্দপতন হোল। বেসামাল আলোড়ন স্বরু হোল। তবু তারা বুঝল না, কোথা দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে। গুপীনাথ মোড়ল কিন্তু কাপড়ের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা ছাড়ল না। স্থির কোরল সবাই মিলে সব কাপড় লোচন পণ্ডিতকে দেবে না, কিছু গাঁট কাপড় ও আসবার আগেই লুকিয়ে গরুর গাড়ীতে চালান দেবে সনকাপুরের হাটে। সেখানে ঠিকা মানুষ দিয়ে বিক্রি করবে সেই কাপড়। ব্যাপারীরা হয়ত বা শুধোবে কোথা থেকে পেলে এ কাপড় ? বলবে শুধু কোম্পানীর কুঠি থেকে।

কোম্পানী তো এখানে দেখতে আসছে না কোন্ কোন্ ব্যাপারীকে সে কত গাঁট দিয়েছে। দ্বিগুণ দরে যদি ওই কাপড়গুলো বিক্রি করতে পারে, তাহলে কোম্পানীর কাছে যে লোকসানটা তাদের চুক্তি করা দামে দিতে হচ্ছে, সেটা অনেকটা উঠে আসবে। কিন্তু এই দ্বিগুণ দামে লোকসানটা হবে কার এটা ভাববার অবসর কই! জোলাদের লোকসান বাঁচাবার জন্যে গুপীনাথ স্থির করল এই ব্যবস্থা ; কিন্তু দামটা যে কাপড়ের বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বাজারের সব দ্রব্যেরই বাড়ল, এর কারণ কে জানে! অত শত দেখবার সময় গুপীনাথের নেই ; গাঁয়ের মানুষেরা যারা সত্যিকারের ক্রেতা তাদের অত ভাবার সময় কই, ভাবলেই বা বুঝতে পাচ্ছে কই যে কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে—বা গড়াবে।

সবাই চড়া দামই মেনে নিল মুখ বুঁজে।

মুখটা কালো হোল শুধু জমীদার চন্দ্রকান্তর। সে বুঝল সব্ এবং আরো বুঝল যে দশহাজার টাকার জন্যে যে স্বাধীনতা সে বিকোল, বহু কোটী মোহরেও তা আর কেনা যাবে না। জোলাদের ব্যবসার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বাধীনতাও বিকিয়ে দিল সে দশহাজার টাকায়। আসল ছাড়াও বিশ হাজার টাকা মুনাফা হয়ত বা কোম্পানী ইতিমধ্যেই করে ফেলছে তাঁরই গাঁয়ের জোলাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে।

জমীদার চন্দ্রকান্ত দিনেও মদের বোতল নিয়ে বসতে স্বরু করল জলসাঘরে। সুকণ্ঠি সুদর্শনা বাঈজীর কণ্ঠনাদে আর ঘাগরার ঘূর্ণনে যদি ভোলা যায় এই পরম আত্মগ্লানি।

চন্দ্রকান্তকে আজকাল জলসাঘরের বাইরে আর বড় একটা দেখাই যায় না। শুধু টাকার প্রয়োজন হলে ডাক পড়ে নায়েব অনন্ত ঘোষালের। টাকা চাই! যেমন করে হোক চাই। অনন্ত ঘোষাল কিছু জমী বেনামী করে। কিছু জমী বেচে দেয়। চন্দ্রকান্ত নির্বিকার! যত খুসী সই করাও—টাকা চাই।

দিন যায়, রাত যায়। সময়ের স্রোতে একটানা তাঁতের শব্দ কাণে এসে বাজে একরামপুর থেকে। একটা বাঁচবার পথ বার করেই ওরা আপাতত খুসী। কে জানে পথে কাঁটা আছে কিনা! সড়কের মোড়ে বটপাকুড় তুলায় সেবারও খুব ধুম করে পূজো হয়। চার জোড়া চৌখুপী সাড়ী আর সিঁদুর—ভেড়া পাঁঠা বলি। চার ঢোলের বাজনায় মুখর ওঠে চারপাশের ধান ক্ষেত।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তখন তাঁর কার্য্যালয়ে বসে ভাবতে থাকে। কোন কোন সদরে কোন কোন ঠিকাদারদের সঙ্গে ফাঁকা চুক্তি করা যাবে। কতদিন পরে বসান যাবে এ দেশটার প্রত্যেক স্নায়ু সন্ধিতে সন্ধিতে একটি করে রেশম কুঠি—যে সব কুঠি থেকে এই বর্বর তাঁত শিল্পের সবটুকু রস এসে ঢেলে পড়বে কোম্পানীর কোষাগারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বাণিয়া বুদ্ধির বলে কূটনীতিজ্ঞ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কোম্পানীর বহু টাকা মুনাফা দেখাতে পেরেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ভাল করে গড়ে উঠছিল এই সব কোম্পানীর মহারথীদের কৌশলে। তাঁদের বণিক বুদ্ধির কুখ্যাত আলোড়নের ধাক্কা এসে লাগল একরামপুরে। একরামপুরের বহুকালের সুমধুর স্তব্ধতা ভেঙে গেল যেন। মূর্খ মৌন মানুষগুলো তবু প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল বাঁচবার, সাঁতার-না-জানা ডুবন্ত মানুষের মত।

লোচন পণ্ডিতের বাড়ীতে পাকা দালান উঠছে। দ্বিতীয় পক্ষের চন্দ্রার গায়ে নোতুন নোতুন অনেক স্বর্ণ আভরণের আমদানী দেখে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে সদাশয় কোম্পানীর ঠিকাদার তাকে বেশ ভাল পয়সা দিচ্ছে।

—কেমন দেখলি ত'? মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন কি না?—পণ্ডিত দাঁত বার করে হাসে।

চন্দ্রা একটু মিষ্টি হেসে চলে যেতে চায়। চন্দ্রার যেন রূপ বেড়েছে আজকাল। রূপের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তনও হয়েছে তার। রূপ যত

বেড়েছে—মনের মাপ তত কমেছে। গোপনে গোপনে সে আজকাল দুচার টাকা লগ্নী কারবারও করছে ; পণ্ডিতকে আজকাল বেশ আদর যত্ন করে! খেতে না চাইলে মাথার দিব্যি দেয়।

—কই মাছটা সবটা খাও। মাথার দিব্যি।—

—না খেলে অত খাটবে কোত্থেকে শুনি ?—চন্দ্রা আবার আক্ষেপ করে।

পণ্ডিত আবার শুধু হাসে।

পাঁচটা মানুষ আজকাল চন্দ্রাকে খাতির করে। চন্দ্রার কাছে এটা ওটা চেয়ে অভাব অভিযোগ জানিয়ে যাতায়াত করে। চন্দ্রার আজকাল জমীদার বাড়ী নিমন্ত্রণও হয়। নায়েব অনন্ত ঘোষালের মারফত। সোনায় দানায় খেয়ে পরে সে এখন মানুষের মত মানুষ।

পণ্ডিত মনে মনে খুব হাসে।

কোনদিন হয়ত বা কাপড়ের গাঁট থেকে একখানা ফুলঝুমকো সাড়ী অথবা একখানা তাজ কন্কা সাড়ী গোপনে বার করে রাখে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর চন্দ্রা যখন শুতে আসে—আলোটা নেভাবার আগে পণ্ডিত বলে,—আগে নিভিও না।

—কেন ?

বালিসের তলা থেকে সাড়ীখানা বার করে দেয় চন্দ্রাকে,—পরো।

চন্দ্রা বোঝে যে এ সাড়ী চুরী করা হয়েছে কোম্পানীর গাঁট থেকে। তবু প্রতিবাদ করে না। সাড়ীটির রঙ বড় সুন্দর। সাড়ী পালটাতে হয় তাকে।

পণ্ডিত মনের সুখে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে দেখে। চন্দ্রা পণ্ডিতের চাউনীতে যেন লজ্জা পায়। মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে, নোতুন সাড়ীখানা পরে প্রণাম করে পণ্ডিতকে।

পণ্ডিত ভারি খুসী হয়। কিন্তু একটু কোথায় যেন বাধে মনে, মনে হয়, এই সাড়ী পরে একটি ছেলে কোলে করে যদি প্রণাম কোরত। তাহলে আরও খুসী হোত ও।

চন্দ্রার মনেও ওই একটিমাত্র ক্ষোভ—ছেলে নেই—এত পয়সা ভোগ করবে কে ?

দরিদ্র হয়েও যদি একটি ছেলে পেত চন্দ্রা !

দুজনে তেমন কথা আর সে রাত্রে হয় না।

পণ্ডিতের রোজগার বাড়ে চুরী উপরী ও মাইনেতে। সহরের ঠিকাদার কিন্তু তার কাজে আজকাল আর খুসী হচ্ছে না তেমন। কাপড় কম দেখে একটু রুষ্ট হয় পণ্ডিতের ওপর।

পণ্ডিত বলে,—কি আর কোরব হুজুর! তাঁতিরাই আজকাল কাপড় বুনছে কম।

—তুমি কিছু খবর রাখো না। ওরা নিশ্চয়ই কাপড় সরাচ্ছে।—ঠিকাদার নীলমনি তরফদার ধমকায় ওকে। সমগ্র জেলা থেকে কাপড় সংগ্রহ করে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানীর সাহেবকে মাল দিচ্ছে আজ সে কত বছর ধরে। তার আগে চামড়ার ব্যবসা করেছে। তার চোখে ধুলো দেয়া ত' সহজ নয়।

পণ্ডিত তবু বলতে চায়।—আজ্ঞে না হুজুর। কাপড় সরিয়ে বাড়ীতে পচিয়ে কি করবে ওরা।

নীলমণি তরফদার আবার ধমকায়,—তুমি একটি মুখ্যু। পচাবে কেন, নিশ্চয়ই গোপনে কোথাও বিক্রি করে। ভাল করে খোঁজ কর।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

পণ্ডিত খোঁজ করবার চেষ্টা আর করে না। কাজেই পরের সপ্তাহে আবার কাপড় কম। ঠিকাদার এবার বেশ গম্ভীর হয়েই বলে,—এরকম কম কাপড় হলে আর তোমাকে দিয়ে চলবে না। কোম্পানীও অসন্তুষ্ট হচ্ছে। সায়েব ত সেদিন আমায় গালাগাল করলে।

—কি কোরব হুজুর।—পণ্ডিত মাথা চুলকোয়—ডাট্‌সন্‌ সায়েবও তাহলে এ জন্যে গালাগাল করেছে।

—তবে এক কাজ করো, আমার ছেলে মাসে এক হপ্তা তোমাদের গ্রামে

যাবে। সে সব খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করবে। তার থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো ?

পণ্ডিত বিগলিত হেসে বলে,—এত আমাদের পরম সৌভাগ্য হুজুর। থাকবে আমার বাড়ীতেই। কবে যাবেন তিনি ?

—আগামী হপ্তায় তুমি এলে তোমার সঙ্গেই যাবে।—ঠিকাদার তার ছেলেকে দপ্তরের পাশের ঘর থেকে ডাকে,—রতন, এই লোচন ভটচাযের বাড়ী গিয়েই থাকবে। এ আমাদের একরামপুর এলাকার গোমস্তা।

রতনমনি তরফদার—বয়েস বছর চব্বিশ—একহারা চেহারা—দেখলে খুবই ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। পণ্ডিত হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঠিকাদার নীলমণি ছেলে রতনমণির বুদ্ধি পাকা করবার জন্যে এই কাজে নিয়েছে ডাট্‌সন্ সায়েবকে বলে। কোম্পানীর ব্যবসার আসল ক্ষেত্রগুলো সে তাকে ঘুরিয়ে আনতে চায়। রতনমণি ছড়া কাটে, গান বাঁধে, বাঁশী বাজায়। বাবার ব্যবসার কিছুই বোঝে না। বোঝবার চেষ্টাও করে না। তবু বাবা যা বলে নীরবে তা পালন করবার চেষ্টা করে অন্যমনস্ক হয়ে।

লোচন পণ্ডিত চলে যায়। পরের সপ্তাহে হুজুরের ছেলে রতনমনি তরফদার আসবে তার বাড়ী। ডাট্‌সন্ সায়েব পর্য্যন্ত রতনমনিকে কত ভালবাসে পণ্ডিত দেখেছে। সদরে ডাট্‌সন্ সায়েবের বাংলোতে যখন জমীদারের চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, তখনই দেখেছে। রতনমণি সায়েবের সামনে চেয়ারে বসে পানীয় কিছু খাচ্ছিল। ডাট্‌সন্ চিঠিটা পড়ে রতনমণিকে বলেছিল, ভাঙা হিন্দীতে,—তোমার বাবাকে একবার পাঠিয়ে দিও।

পণ্ডিতকে ইসারায় চলে যেতে বলেছিল।

রতনমণি কি কম!

পণ্ডিত বাড়ীতে এসে রতনমণির আগমন উপলক্ষ্যে নানা আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জমীদার বাবুর সঙ্গেও তার দেখা করিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করবার জন্যে নায়েব মশাইয়ের কাছে বলে রাখে। বাড়ীতে চন্দ্রাকে পই পই করে বলে

রতনমনির সকালের জলখাবার কি, দুপুরের মাছের রান্না ক'টা, বিকেলে কতটা দুধের ক্ষীর দিতে হবে। কোনরকমে যেন সে অপমানিত না হয়, তবে চাকরীটি যাবে।

একরামপুরেও খবরটা পৌঁছয়। খবরটা প্রথম কানাইয়ের বাড়ীতে দেয় গদাই—শুনিছিস, তোদের পণ্ডিতের বাবা আসছে।

—পণ্ডিতের বাবা কি সগ্‌গ থেকে আসবে !—কানাই হাসে।

গদাই নিজের রসিকতায় কানাইয়ের পাল্‌টা রসিকতায় হাসতে হাসতে ভুঁড়ি দোলায়—সদরের ঠিকাদারবাবুর ছেলে আসবে। তার তোয়াজের জোগাড় করতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে পণ্ডিত।

—চ' দু' চাল মাত্‌ করে যাই তোকে।

—না আজ পারবো না, রান্না চড়াতে হবে।

গদাই আকাশ থেকে পড়ে,—কেন, তোর বউ ?

—আরে সে তো শুয়ে পড়ে কোঁ কোঁ কচ্ছে। জ্বর। তার ওপর আবার ছেলেপিলে হবে। সবই ত' আমার করতে হয়।

গদাই বলে,—রেখেদে তোর কাজকম্ম ! একটা বোড়ের চালে সব মাথায় উঠে যাবে চ'।

কানাই কথা বলে না, ভাবতে থাকে।

—কি ভাবছিস রে, হাঁ করে তাকিয়ে।

কানাই শুধু একবার—হুঁ শব্দ করে।

গদাই চটে যায়,—দুত্তোর ! কি ভাবছিস প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে ?

—ভাবছি।—কানাই আস্তে আস্তে বলে, ভাবছি এইবার পণ্ডিতকে জব্দ করা যাবে।

কেন ?—

ওই ঠিকাদারের ছেলেকে যদি ওর চুরীর কথা বলে দিতে পারি, তবে কাজ হবে মনে হয়। গদাই হো হো করে হাসে,—সে গুড়ে বালি।

কেন ?

ছেলে থাকবে পণ্ডিতের বাড়ীতেই। বলতে যাবি কোথায় ?

হেথায় কি একদিনও আসবে না ?

এলেও পণ্ডিত সঙ্গে থাকবে।

কানাই আবার চিন্তিত হয়। পাশের ঘর থেকে থাকোমণির নাক-ডাকার শব্দ আসে। ভরসন্ধ্যেবেলা বিভোরে ঘুমুচ্ছে। গদাই কাঁধে একটা চড় মারে—চ' চ', এক চাল বসি। তোর ভাবনা খুলে যাবে দেখবি।

কানাইকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গদাই দাবায় বসে।

কথাটা গদাই শুনেছে খুড়ো গুপীনাথের মুখেই। গুপীনাথ মনোহর আরও জনকতক মোড়ল স্থানীয় তাঁতি মিলে পরামর্শ করেছে—আগামী সপ্তাহে সনকাপুরের হাটে কাপড় পাঠান হবে না। সদর থেকে কোম্পানীর ঠিকাদারের ছেলে আসছে। কে জানে কেমন লোক। যদি ধরে ফেলে। তার পরের সপ্তাহে পাঠান হবে সনকাপুরের হাটে; কিন্তু কাপড়ের গাঁটগুলো লুকিয়ে রাখবে কে? এই এক সমস্যা। কেউ সাহস পায় না।

প্রহ্লাদ উপস্থিত ছিল। ও বলে, আমার ঘরে রাখব। কোন শালা কি করবে।

এক রোখা গোঁয়ার প্রহ্লাদের দিকে গুপীনাথ সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায়,—পারবি লুকোতে ?

খুউব !

শেষ পর্যন্ত ওর ঘরে কাপড়ের গাঁট লুকিয়ে রাখাই স্থির হয়।

কথাটা নীরুর কানেও যায়। প্রহ্লাদ পরামর্শের পর ঘরে ফেরে দুপুরে। খাবার পর বসে ছিল প্রহ্লাদ তাঁত ঘরে। হঠাৎ নীরু এসে ঘরে ঢোকে। নীরুর আসাটা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। প্রহ্লাদ একটা শাড়ীর সুতো পরীক্ষা করছিল। মুখে তুলে নীরুকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু হতভম্ব হয়ে যায়।

নীরুও খাওয়া দাওয়া সেরেই এসেছে। ভিজে চুল শুকোয়নি বলে পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়েছে। পান খেয়ে ঠোঁট দুটি রাঙা করেছে। চোখে মুখে কিন্তু একটা রাগ আর আতংকের ভাব। এসেই প্রহ্লাদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রুখে বলে,—কি মনে মনে ভেবেছ বলোত ?

প্রহ্লাদ বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কথার উত্তর দিতে পারে না হঠাৎ। নীরু আবার বলে,—তার চেয়ে একেবারে মেরে ফেললেই ত' হয়। এমন জালিয়ে মারবার কি দরকার শুনি ?

এতক্ষণে প্রহ্লাদ শুধোয়—কি হোল তোর ?

—থাক্। আর ন্যাকা সেজো না। মোড়লের বাড়ী গিয়ে কি কথাবাত্রা বলে আসা হোল শুনি ?

—তুই শুনিসনি বুঝি ?—প্রহ্লাদ নরম স্বরে বলতে যায়—সনকাপুরের হাটে এবার কাপড় যাবে না। কাপড়গুলো থাকবে আমার ঘরে।

নীরু জ্বলে ওঠে,—আহা, হা, কি বুদ্ধি ! ঠিকেদার বাবুর ছেলে ধরে আবার তোমায় আটক ঘরে নিয়ে যাক, আর আমাদের শুদ্ধ নিয়ে টানাটানি করুক ! ওসব হবে না বলে দিলুম।

—কি হবে না ?

—ঘরে কাপড় লুকিয়ে রাখা-টাকা হবে না। রাখলে আমি নিজে ঠিকেদার বাবুর ছেলেকে বলে দিয়ে আসব। বুঝবে ঠ্যালা !

—দিয়ে আসিস বলে ! তুই যদি আমার নামে কোটনা হতে পারিস। যাব আবার আটকঘরে। মিটি মিটি হাসতে হাসতে প্রহ্লাদ বলে।

চুলের গোছা হাতে নিয়ে হাত খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলে নীরু,—হাসি দেখলে তোমার গা জ্বলে যায়। তুমি কিছুতেই ও কাপড় ঘরে রাখতে পাবে না।

ওর অন্যায় জিদে প্রহ্লাদ একটু বিরক্ত হয় এবার—কেন তোর তাতে কি ?

—আমার কি আবার। আমাকে শুদ্ধ যে চোর বলে ধরে নিয়ে যাবে।

—আমার ঘরে কাপড় থাকলে তোকে ধরবে কেন ?

—তোমার সঙ্গে অত উল্টো তর্ক করতে চাই না। সোজা কথা বলে রাখলুম তুমি ও কাজ করতে যেও না। আমি মোড়লকে গিয়ে বারণ করে দিয়ে আসব।

প্রহ্লাদের মাথায় একটু বুদ্ধি আসে,—বলে, তুই যদি মোড়লের কাছে গিয়ে

আমার নামে বারণ করে দিয়ে আসতে পারিস, তবে আমি কাপড় লুকিয়ে রাখব না। পারবি যেতে?

নীরুর মুখখানা অকস্মাৎ রাঙা হয়ে ওঠে, তবু বলে,—খু-উ-ব।

প্রহ্লাদ একটু হেসে বলে,—যদি শুধোয়। প্রহ্লাদের হয়ে তোমার অত দরদ কেন, কি উত্তর দিবি?

নীরু এবার গম্ভীর হয়,—তোমাকে ত' মস্করা করতে আমি বলিনি। মোড়লকে বারণ করে দিয়ে আসবে কিনা শুনতে চাই!

—তুই যেতে পারবি না?

নীরু যেন ধমকে ওঠে,—আবার! বল আমার কথা শুনবে কি না?

প্রহ্লাদ পেয়ে বসেছে,—তুই আমার কোন কথাটা শুনিস?

নীরু জবাব দেয় না।

তাঁত ঘরের সামনে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রহ্লাদ। ডান দিকে ঘাটের পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটায় অনেক ফুল—ঝরে ঝরে পড়ছে। কৃষ্ণচূড়ার চূড়ার ওপর আকাশে চোখ ঝলসানো রৌদ্র। প্রহ্লাদ চোখ নামায়,—আচ্ছা যাব মোড়লের বাড়ী। বলে আসব।

নীরু তবু দাঁড়িয়ে থাকে। যেন কথাটা এখনও শেষ হয়নি প্রহ্লাদের।

প্রহ্লাদও চুপ করে বসে থাকে মুখ নীচু করে।

নীরু তবু দাঁড়িয়ে থাকে। এত সহজে প্রহ্লাদ রাজী হয়ে গেল, কথা শেষ হয়ে গেল।—এমন ত আশা করেনি সে। প্রহ্লাদ আরও কিছু বলুক।

প্রহ্লাদ কিন্তু কিছুই বলে না।

নীরুই অবশেষে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে,—শরীরটা ভাল আছে ত' আজকাল?

অর্থাৎ আটকঘর থেকে আসবার পর শরীর যে রোগা হয়ে গিয়েছিল, সেটা সেরেছে কিনা?

—ভাল আছে।—প্রহ্লাদ আস্তেই বলে।

আবার কথা শেষ! নাঃ। হাঁপ ধরে যায় নীরুর। এমন বোবা মানুষটা।

একটু হে

হাসে।

নীরু

দরজ।

নীরু

প্রহ্ল।

না খেয়ে ম.

নীরু চম।

—কেন

লোহায় মরচে

নীরু অবা

প্রহ্লাদ ব.

ঠিক জেনেছিস

আজ যেন ও

থাকলে বোধহয় গা।

একদম ভাল লাগে

জাঁহাবাজ মেয়ে নী।

—কেন জানি না। —প্র

নীরু যেন একটু ভয় পেয়ে বলে,—

না।—হাসে প্রহ্লাদ।

—তবে আজ এসব অলুক্ষণে কথা বলছ কেন শুনি।—

নীরু। মুখের পানটা এতক্ষণে আবার চিবোতে পারে।

প্রহ্লাদ আজ অমায়িক হাসে,—এমনি মনে হোল, তাই বললুম। তুই ভ.

পেয়ে গেলি?

নীরু পানটা দুবার এগাল ওগাল করে বহুদিন ভেবে রাখা একটা কথা আজ বলে।

.য়টি ত'"

তোমারও.

াই ডাকবার

াদের মায়ের

মার সঙ্গে গল্প

?

?

ছে।

হয় ভাল করে

৭

অবশেষে রতনমনি তরফদার এলো। লোচন পণ্ডিতের বাড়ীতেই উঠল এসে। সবাই ভেবেছিলো একটা হোমরা ছোমরা গোঁপওলা কেউ বা হবে; কিন্তু এ যে একেবারে অবাক কাণ্ড! ছিপছিপে রোগা ফরসা অল্পবয়সী একটি ছেলে।

সব চেয়ে অবাক হোল চন্দ্রা। ওমা এই! এই ঠিকেদারের ছেলে! এ আবার চোর ধরবে! ওর ভাসা ভাসা চোখদুটোর দিকে ঘোমটার তলা থেকে তাকিয়ে চন্দ্রা ভয় ত' পেলই না। উলটে কেমন একটু মমতা হোল। ভারি সুন্দর মানুষটি ত'!

চন্দনডাঙার সবাই এসেছিল সেদিন লোচনের বাড়ীতে রতনমনি তরফদারকে দেখতে। পণ্ডিত ব্যস্ত হয়ে বলে,—এখন সব যাও বাপু! বড মানষের ছেলে এত ভীড় সইবে না। একটু জিরুতে দাও।

তবু সবাই একবার দেখে যায়। রতনমণি ভীড় দেখে একটু বিব্রত হয়। তবু গেঁয়ো লোকগুলোর ভয়-ভয় চাউনী,—বিশেষ করে মেয়েগুলোর সরল চাউনী ভাল লাগে রতনমণির।

লোচনকে শুধোয়,—সবই কি তাঁতি?

—না, না, গেরস্ত আছে, চাষী আছে, জোতদাব আছে; কতরকম! বুদ্ধি-সুদ্ধি এদের যদি একটু থাকে ছোটবাবু।

ছোটবাবু সম্বোধনে রতনমণি একটু অবাক হয়। পর মুহূর্তেই ওর যেন খেয়াল হয় নতুন করে যে ও কোম্পানীর ঠিকাদার নীলমণি তরফদারের ছেলে।

ভীড় কমে।

চন্দ্রা এসে তেল গামছা দিয়ে যায়। রতনমণি গামছাও নেয় না, তেলও নেয় না। বাক্স থেকে সাবান বার করে আর বার করে তোয়ালে। পণ্ডিত ভাবে বুঝি

তার কিছু ত্রুটির জন্যেই তেল গামছা নিলো না। তারপর তোয়ালে সাবান দেখে অবাক হয় একটু। সাবান ত' ওরা জন্মেও মাখে না! মাথায় ময়লা পড়লে রিঠে অথবা সাজিমাটীই ব্যবহার করে ওরা।

ভেতরে গিয়ে চন্দ্রাকে ডেকে আনে দোরের পাশে,—দেখ, বড় মানষের আদব-কায়দাই আলাদা। তাকিয়ে দেখ।

রতনের চোখ পড়ে দরজার দিকে, চন্দ্রার মুখটুকু শুধু আবছা দেখতে পায়। বিহ্বল কালো দুটো চোখ ঘোমটার তলায়। রতনমণির ভাল লাগে দেখে। বেশ মুখখানি ত'!

পণ্ডিত ভেতরে আসে,—পুকুরে যাবেন?

—না, না, এখানেই ইঁদারা থেকে জল তুলে দিতে পারলেই হয়।

পণ্ডিত কুয়ো থেকে জল তুলতে বলে দেয় চন্দ্রাকে। নিজে মাথায় এক খাবলা তিল তেল ঠেসে পুকুরের দিকে ছোটে।

রতন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে। রোয়াক থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকায়। চোখে পড়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে জল তুলছে চন্দ্রা কুয়ো থেকে। মাথায় ঘোমটা নেই। রোদের তাতে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। সুডোল পরিষ্কার হাতদুটি দিয়ে তরতর করে উঠিয়ে আনছে কুয়োর দড়ি। এলো খোঁপা বাঁধা, কপালে কাঁচ-পোকার মাঝারি একটি টিপ পাশ থেকে দেখা যায়।

রতনমণি নির্ণিমেষ চোখ মেলে দেখে। কিছুক্ষণ দেখে ওর আরও দেখতে ইচ্ছে হয়। এটাও বোঝে যে এভাবে লুকিয়ে কাউকে দেখাটা অন্যায়। তবু ও এমন সুন্দর ছবিটা যেন দেখবার লোভ সামলাতে পারে না। সদরে থেকে থেকে ওর মনের আসল কবি মানুষটি যেন তৃষ্ণার্ত হয়েছিল এতদিন। চন্দনডাঙার মাটি, আকাশ, গাছপালা মাঠ আর এমন সুন্দর একটি বধুর কুয়ো থেকে জল তোলা, সব মিলিয়ে ওর মনে রঙীন বাষ্প জমতে সুরু করে। রতনমণি ছড়া বানায়, বাঁশী বাজায়, আর ভালবাসে সুন্দর সবকিছুকে।

চন্দ্রা দেখতে পায়নি রতনমনিকে। রতনমনির দেখতে দেখতে যেন মায়া হয়।

এই রৌদ্রে অত জল তুলে দেয়া তার স্নানের জন্যে, বড় কষ্ট হচ্ছে বউটির। রতনমনি এগিয়ে যায়,—আমাকে দিন, আমি জল তুলে দিচ্ছি।

চন্দ্রার হাত থেকে ঝপ্ করে দড়িটা পড়ে যায় কুয়োর পাড়ে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানে চন্দ্রা; কিন্তু ঘোমটার আঁচল যে বাঁধা রয়েছে কোমরে। টানলেও সাড়ী মাথার ওপর আসে না। রতনমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে এই লজ্জার ভাবটুকুও।

চন্দ্রা আঁচল খুলে ঘোমটা টানে। আবার জল তুলতে থাকে।

—আপনি সরুন। এই রোদ্দুরে আপনাকে আর—বলে আবার রতনমণি। কিন্তু চন্দ্রা সে কথার জবাব না দিয়ে জল তুলতে থাকে। চন্দ্রা ভালভাবেই জানে যে রতনমনিকে জল তুলতে যদি পণ্ডিত দেখে, তবে হয়ত তাকে মেরেই বসবে।

রতনমনি আর কিছু বলে না।

জল তুলে দিয়ে চলে যায় চন্দ্রা।

স্নান সেরে রতন ঘরে আসতে আসতে পণ্ডিত এসে পড়ে। এসেই বলে,—আসুন ছোটবাবু আসন হয়ে গেছে।

পণ্ডিতের শোবার ঘরেই ওদের ঠাঁই হয়েছে। রতনমনি বসে, পণ্ডিতও বসে। চন্দ্রা পরিবেশন করতে থাকে।

আয়োজন দেখে রতন অবাক। একটা রাক্ষসের খাবার মত আয়োজন।

—এ সব আপনাকে তুলে নিতে হবে, শুধু দুটি ভাত আর একটু মাছ খাব।

পণ্ডিত হাঁ-হাঁ করে ওঠে,—তা কখনও হয়! এত কিছুই নয়। এটুকু না খেলে আর কি খাবেন? এ বোধ হয় আমাকে ঠাট্টা করে বলছেন—আয়োজন ভাল করতে পারিনি বলে!

রতন অবাক,—বলেন কি মশাই! ঠাট্টা! এসব খেলে যে মারা পড়ব এখানে।

পণ্ডিত তবু বলে,—তোলবার দরকার নেই। আপনি খেতে থাকুন। শেষকালে দেখবেন এ কটা ভাত উঠে গেছে গপ্পে গপ্পে।

রতন আর কথা না বলে খাওয়া সুরু করে।

চন্দ্রা সামনে পাখা নিয়ে বসে। মাথায় ঘোমটা। বাতাস করতে থাকে। রতন বলে,—থাক আর বাতাসের দরকার নেই।

চন্দ্রা তবু পাখা থামায় না।

পণ্ডিত একগ্রাস মুখে পুরেই বলে,—ঠিক আছে। বাতাস না করলে আবার মাছি বসতে পারে ত'! তবে খাওয়াটাই নষ্ট হবে।

রতন চাট্টি ভাত একটু মাছ আর একটু পায়েস খায়।

রান্নাটা অত্যন্ত ভাল লাগে,—বাঃ! চমৎকার রান্না হয়েছে ত'?

—আর একটু দেবে?—পণ্ডিত বলে।

রতন বলে,—ভাল বল্লেই আবার দিতে হবে? শেষকালে পেট ফাটিয়ে মারবেন নাকি?

চন্দ্রা বাতাস দিতে দিতে হাসি চাপতে পারে না রতনের কথায়। হাসির শব্দ পায় এরা। পাতে সব পড়ে থাকে। রতন বলে,—উঠি তাহলে।

—উঠবেন কি ছোটবাবু। এ যে চড়াইয়ের চেয়েও কম খাওয়া হোল।

—হাত জোড় কচ্ছি। আর পারবো না। তাছাড়া আমি এই রকমই খাই।

রতন উঠে পড়ে।

পণ্ডিত চন্দ্রাকে বলে,—জল দাও আঁচাবার। পান দাও।

—একটু জল দিন শুধু। পান খাইনা। আচ্ছা আজ একটা দিন।

কথাগুলো রতন চন্দ্রাকে লক্ষ্য করেই বলে।

চন্দ্রা ঘোমটাটা একটু কমিয়েছে।

আঁচাবার জল দিতে যায়।

খাওয়া সেরে একটু দিবানিদ্রার পর রতনমণি যখন ওঠে তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। পণ্ডিত আসে,—চলুন আজ একবার একরামপুর ঘুরে আসি।

আজ থাক! কাল যাওয়া যাবে,—রতন অনুনয় করে বলে। এমন মধুর সন্ধ্যাটা সে তাঁতিদের সাড়ী আর ধুতির হিসেব করে কাটাতে চায় না। বরং সামনের মাঠটায় গিয়ে বসে সন্ধ্যায় একটু বাঁশী বাজালে কাজ হবে।

পণ্ডিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে,—তবে থাক। কাল একবার এখানকার জমীদার বাড়ী যেতে হবে ছোট বাবু। উনি লোক পাঠিয়ে বলে পাঠিয়েছেন।

—বলে পাঠালেই যেতে হবে। বিরক্ত হয় রতনমনি,—আপনিও বলে পাঠান কাল আমার যাবার সময় হবে না। আমার সুবিধেমত আমি যাব।

পণ্ডিত মাথা চুলকোয়,—কিন্তু জমীদার—।

—জমীদার আপনার। আমি তার প্রজা নই।—রতন মুখ ফেরায়। চন্দ্রা ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে জলখাবার নিয়ে।

রতন বলে,—এখন আবার এগুলো কি করে খাই?

যেন মহা বিপদে পড়ে গেছে রতন।

চন্দ্রা হাসি চাপে।

—তা পারবেন ছোটবাবু। আপনি দুটো দুটো করে গালে ফেলে দিন। আটটা ত মোটে পান্তুয়া!

রতন হাত বাড়িয়ে খাবার নেয়।

একটা পান্তুয়া খেয়ে এক গ্লাস জল খায়।

—কাল তা হলে জমিদারবাড়ী যাবেন না ছোটবাবু। কিন্তু আমার ওপর যে তাহলে খাপ্পা হয়ে যাবে।

রতন পণ্ডিতের ভীত গলা শুনে একটু হাসে,—আচ্ছা, কাল সকালে যাব।

পণ্ডিত যেন বাঁচে—বলে,—তাহলে একরামপুরে?

—কাল বিকেলে যাব,—বলে রতন—তারপর পরশু সকালে কাপড়ের গাঁটগুলো দেখে দুপুরে চলে যাব আমি সদরে।

পণ্ডিত ঘাড়নেড়ে বেরিয়ে যায় চন্দ্রাকে বলতে রাত্রির খাবার শোবার বন্দোবস্ত করতে।

সন্ধ্যা উত্‌রে যায়। পণ্ডিত বেরিয়েছিল পাড়ায় এখানে ওখানে রতনমনির সম্বন্ধে নানাজনের নানা কৌতূহল মেটাতে। চন্দ্রা রান্নায় ব্যস্ত ছিল। ওবেলা রান্নার প্রশংসায় চন্দ্রা খুব উৎসাহিত হয়েছে। ও আরও যত্ন করে ভাল করে রাঁধবার চেষ্টা কর্‌ছে। রাঁধতে রাঁধতে একা একাই মুখ টিপে হাসে রতনের কথা

মনে করে। বেশ মানুষটি। সরল সোজা। সব কাজেই রতনের সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় পেয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে গেছে চন্দ্রা। খাওয়াটি পর্যন্ত পরিষ্কার অল্প। এ বেলা তাই চন্দ্রা খুব অল্প রান্না করে কিন্তু খুব ভাল করে রাঁধে।

রান্না শেষ হবার পর রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসে চন্দ্রা। গরমে হাঁপ ধরে গেছে। মাথার আর পিঠের আঁচল খুলে ছড়িয়ে বসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে। মৃদু মৃদু বাতাসে ওর গায়ের কিছু কিছু ঘাম শুকোয়। নির্জন সন্ধ্যায় একা একা আজ বড় ভাল লাগে চন্দ্রার। রতনমনি কোথায় গেছে কে জানে! হয়ত পণ্ডিতের সঙ্গে বেরিয়েছে। হয়ত বা ঘরেই আছে। কিন্তু ঘরে ত আলো নেই। আলোটা কি নিভে গেছে?

একটু পরেই বাতাসে কানে ভেসে আসে ভারী মিষ্টি বাঁশীর সুর। মৃদু বাতাসের তরংগে সুর ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে যেতে ভেসে আসে।—যেন ফিস্ ফিস্ করে কানে কানে কথা কয়। চোখদুটো গভীর আনন্দে স্তিমিত হয়ে আসে চন্দ্রার। কে বাঁশী বাজায় এখন। আট বছর এ গাঁয়ে এসেছে চন্দ্রা বিয়ে হয়ে। এর ভেতর কোন দিনই ত' এখন বাঁশীর সুর তার কানে আসেনি! শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যায় চন্দ্রা।

রাগ সোহিনী। সোহিনী রাগে সুর ধরেছে রতনমনি। ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই ছোট একটু মাঠ। কচি ঘাসে ভরা মাঠটুকু। মাঠের সামনে আম বাগান। মাঠে বসে পড়ে রতনমনি। বাঁশীর সুর মৃদু বাতাসে আসে পাশে ভেসে যায়। নির্জন গাঁয়ের কোনে সোহিনী রাগের গভীর প্রেম-বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে ওর সুরে। কিছু দূরে মাটির ঘরে ছেলেকে কাঁথা পেতে শোয়াতে শোয়াতে কোন বউ হয়ত স্তব্ধ হয়ে যায়। কান পেতে শোনে। কোথা থেকে ভেসে আসছে আজ তাদের প্রাণের অব্যক্ত ভাষা। অন্তরের গভীরতম কোন কোমল অনুভূতিকে উন্মুক্ত করে দেয়। তার চিরদিনের নিহিত গোপন প্রেম আজ ভেসে ওঠে চেতন মনের স্তরে। সুরের যাদুতে ওরা স্তব্ধ হয়ে যায়। ধানের মরাইয়ের কাছে ঝাঁপ বন্ধ করতে গিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করা আর হয় না। ভুল হয়ে যায় চোখের সামনের সংসার। বহুকাল ভুলে যাওয়া

আনন্দের ছোট ছোট বুদ্বুদ মনের সমুদ্রে ফোটে—ফাটে—আবার মিলিয়ে যায়।

কে বাঁশী বাজায়? সবাই-ই ভাবে। ঠিক ধরতে পারে না। বহুক্ষণ পর বাঁশী থামে। চন্দ্রা চোখ মেলে দেখে রতন ঘরে ঢুকছে। ঘরে বসে রতন আবার বাঁশীতে ফুঁ দেয়। ঘর থেকে এবার স্পষ্ট স্বর কাণে আসে।

রতনমনি! ওই পাতলা ফরসা সুন্দর রতন এমন ভাল বাঁশী বাজায়। আনন্দে চন্দ্রার গায়ে রোমাঞ্চ হয়। মনের উচ্ছ্বসিত হাসি সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ে। চন্দ্রা চোখ বোঁজে আবার।

পরদিন সকালে জলখাবার পরই রতনমনিকে তাগাদা করে নিয়ে যায় পণ্ডিত জমীদার বাড়ী। কাছারীর ঘরে এসে সামনের বেঞ্চিটায় বসে পণ্ডিত। জমীদার চন্দ্রকান্ত—তখনও কাছারীতে আসেননি। নায়েব অনন্ত ঘোষাল রতনমনিকে আপ্যায়ন করে। রতনমনি সামনের বেঞ্চিতে না বসে জমীদারের ফরাসের উপর পা তুলে বসে। জমীদারের জরীর তাকিয়াটা ঠেস্ দিয়ে।

পণ্ডিত একবার কেঁপে ওঠে। স্বয়ং হুজুরের তাকিয়ে! সর্বনাশ! তবু রতনমনিকেও বারণ করবার সাহস হয় না ওর। জয় দুর্গা নাম জপ করতে থাকে পণ্ডিত। আজ সর্বনাশ করবে এই চ্যাংড়া ছোঁড়াটা!

কিছুক্ষণের ভেতরেই জমীদারের মখমলের চটির আওয়াজ—সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে বসে। রতনমনি তাকিয়া ঠেঁস দিয়ে বসে বসেই ঝাড লণ্ঠনের কটা বাতি গোণবার চেষ্টা করে।

জমীদার চন্দ্রকান্ত ঘরে ঢুকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার রতনমনির দিকে তাকায়। রতনমনি প্রত্যুত্তরে একটু হেসে হাত জোড় করে নমস্কার করে। চন্দ্রকান্ত বুদ্ধিমান। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি নমস্কার করে একটু হেসে ওঠে ফরাসের ওপর।

পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে নিবেদন করে, হুজুর। কোম্পানীর ঠিকাদার নীলমণি তরফদারের পুত্র রতনমনি তরফদার। এর কথা আপনি বোধহয় অবগত আছেন।

চন্দ্রকান্ত বলে,—হুঁ, অনন্ত বলেছিল বটে।

গড়গড়ার নলটা ঠোঁট চেপে-ই বলে চন্দ্রকান্ত—মশায়ের আদি নিবাস?

রতনমনি বলে,—শুনেছি বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলায়।

চন্দ্রকান্ত বলে,—আপনি কি কখনও যাননি সেখানে?

রতনমনি একটু হেসে বলে,—আঁজ্ঞে না। বাবা বরাবর ব্যবসাই করেছেন। ইদানীং ত তিনি কোম্পানীর কাজ নিয়ে সদরে আছেন।

চন্দ্রকান্ত তামাক সেবনে মগ্ন থাকে। তার গোলাপী মুখের উপর নীল ছায়া পড়েছে যেন আজকাল। বহু বিনিদ্র রাত্রির অত্যাচারে আর কোহলের আধিক্যে চল্লিশেই তাকে পঞ্চাশ বলে ভ্রম হয়।

চন্দ্রকান্ত যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়।

অনেক পরে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে রতনমনিকে,—আপনার নামটি কি?

রতনমনি তরফদার।

এসেছেন যখন এখানে একটি কাজ আপনাকে দয়া করে আমার হয়ে করতে হবে।

রতনমনিকে একটু কাছে ডেকে নেয় চন্দ্রকান্ত।

বলে আস্তে আস্তে,—ডাট্‌সন্ সাহেব বলেছিলো একটি কুঠি করবার পরিকল্পনা আছে কোম্পানীর আমার এলাকায়। এই এলাকা থেকে বছরে ত কম তাঁতের কাপড় যায় না? কুঠিটি যদি করেনই; তবে সায়েব যেন আমাকে আগাম কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন কুঠির খরচা বাবদ। আমিই সব ব্যবস্থা করে দোব। বলতে পারবেন?

রতনমনি ঘাড় নাড়ে,—বলা যাবে সায়েবকে; কিন্তু কুঠি শীঘ্র হবে বলে কিছু শুনিনি। হলেও সেটা বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করে সায়েব করবেন না।

চন্দ্রকান্ত চোখ দুটো একটু বেঁকে যায় কি একটা বাঁকা চিন্তায় তারপর একটু সময় নিয়ে বলে,—আপনার বাবারও এতে সুবিধে হবে। কাপড় ত' তিনি সব এখন পাচ্ছেন না। আমার ধারণা কিছু কাপড় চুরী করে রাখে জোলারা।

রতনমনি উলটো চাপ দেয়। একটু মুচকী হেসে বলে,—বলেন কি? আপনি জমীদার হয়ে আপনার প্রজাদের চোর ধরছেন, অথচ তার কোন প্রতিবিধান করছেন না!

চন্দ্রকান্ত বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। মুখটা একটু লাল হয়ে ওঠে তার,—আমি ত' ঠিক জানিনে, ধরতেও পারিনি। তবে কুঠি করলে এ সব চোরাই চালান ধরা পড়বে। আপনাদের ঠিকেদারী চুক্তির টাকাটা অবশ্য ঠিক রেখে দেবেন।

মানে—চন্দ্রকান্ত চোখ টিপে বলে,—আমিও কিছু পাই। আপনারাও বেশী পান এখানকার চেয়ে। কথাটা আপনার বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন। সায়েবকে ত বলবেনই।

রতনমনি স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে, ধীরে ধীরে বলে,—কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারছেন না, এতে করে কত বড সর্বনাশ হবে আপনার প্রজাদের। আপনার নিজেরও। ক্রমে হয়ত দেখবেন রেশম কুঠিই জমীদারী করে বসেছে; আপনি ভিখারী। ভাল করে ভেবেছেন সে কথা।

ভেবেছি।—সমস্ত মুখখানা আবার নীল হয়ে আসে চন্দ্রকান্তর,—জানি রতন বাবু আমাদের দিন ফুরিয়েছে। এখন আপনাদের দিন। তাই আমি চাই উই ধরা ভিটে একেবারে ভেঙে পড়ুক। তার ওপর আপনাদের নোতুন ইমারত হোক। এটা আঁকড়ে ধরে রেখেই কি কিছু লাভ হবে।

আপনিই বলুন আঁকড়ে রেখে কি এ ভাঙান রোখা যাবে?

রতনমনি চুপ করে থাকে। চন্দ্রকান্ত ইচ্ছে করেই এই বহু পুরাতন প্রাসাদের ভিত ভেঙে দিয়ে চলে যেতে চায়। চন্দ্রকান্ত দূরদর্শী, ও জানে এ প্রাসাদ আর থাকবে না।

চূড়ান্ত অপমান হবার আগে একে নিজে হাতে ভেঙে দিয়ে যাওয়াই ভাল।

রতনমনি চন্দ্রকান্তর দিকে শ্রদ্ধানত দৃষ্টিতে তাকায়।

লম্পট নিশাচর চন্দ্রকান্ত গভীর ভাবে তামাক টানতে থাকে। মনটা ওর তামাকের ধোঁয়ার মতই ঘন হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ বসে রতনমনি বলে,—উঠি আজ। আপনার কথা মনে থাকবে।

আর একটা কথা,—চন্দ্রকান্ত রতনমনির দিকে তাকায়,—বগুড়ায় আমার একটা বড় মহল আছে। দেখা শোনার অভাবে আদায় পত্র হয়ে ওঠে না। তা' ওটা বিক্রি করে দিতে পারি। আপনার বাবাকে বলবেন, সামান্ত টাকা হলেই আমার চলবে,—হাজার আষ্টেক। বলবেন।

যে আজ্ঞে!

রতনমনি ওঠে।

পণ্ডিত দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে জমীদার চন্দ্রকান্তকে। ওদের গোপন পরামর্শ শুনে বিস্মিত হয়ে যায় পণ্ডিত। যে ব্যবহার আজ রতনমনি জমীদার বাবুর সঙ্গে করেছে তাতে অন্য যে কেউ হলে এতক্ষণ আটকঘরে চলে যেত। কিন্তু রতনমনিকে অত খাতির করে যে কেন জমীদার বাবু কথা বললেন পণ্ডিত ভেবে পেলো না।' আজীবন জমীদার বাবুকে দেবতার মত ভক্তি করে এসেছে ওরা। আজ যেন দেবতার অপমান করে গেল রতনমনি। পণ্ডিত একটু আহত হয়। তাদের বাপ পিতামহ যাঁদের আভূমিনত হয়ে প্রণাম করেছে। এই ছোঁড়াটা আজ তাদের তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় যেন। এ যে কত বড় অসম্ভব দৃশ্য। কালে কালে কি আরও দেখতে হবে?

রাস্তায় রতনমনির সঙ্গে পণ্ডিত কথা বলল না।

রতনমনিও গাঁয়ের চারিদিকের গাছপালা মাঠ দেখতে দেখতে কি একটা চিন্তায় মগ্ন হয়ে পথ চলছিলো।

বাড়ী এসে বললে পণ্ডিত,—একরামপুরে যাবেন ত' বিকেলে?

না!—অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরেই বললে রতন।

রতন জানে যে খবর এর ঘুরে ঘুরে জোগাড় করতে হবে না। যে যার স্বার্থে খবর দিয়ে যাবে তাকে যেচে। ঠিকেদার নীলমণি তরফদারের ছেলে রতনমনি সংসারের এ দিকটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে যে শত্রু এবং মিত্র দুই ই টাকার গন্ধ পেলে ছুটে আসে। টাকা তাদের আছে—এবং গন্ধ পেয়ে ছুটে আসবেই।

এলো ঠিকই।

বিকেলের দিকে পণ্ডিত বেরিয়ে গেছে তখন।

একটা লোক বাইরে থেকে ডাকছিল,—হুজুর আছেন ?

রতনমনির ঘরটা বাইরের ঘর। আর পণ্ডিতকে কেউ হুজুর বলবে না, বলবে তাকে, এ ধারণাটা তার ছিল। ঘর থেকে সে বেরোল। বেরোতেই লোকটা মাটীতে মাথা রেখে প্রণাম জানায়।

তুমি কে ?

বেঁটে রোগা লোকটা একপাশে বেঁকে গিয়ে বলে, আঁজ্ঞে এ অধমের নাম কানাই বসাক। একরামপুরে থাকি।

ঠিক লোকই এসেছে, মনে মনে হাসে রতন। কি দরকার তোমার ?

কয়েকটা কথা ছিল হুজুর। শুনলুম আমাদের গাঁয়ে নাকি আপনি পায়ের ধুলো দেবেন না, তাই নিজেই আসতে হোল।

ও কথার উত্তর না দিয়ে রতন বলে,—তোমার কথাটা কি শুনি ?

বিশেষ কিছুই নয়! হুজুরের যে লোকসান হয় মাঝে মাঝে দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। কাপড় কি সবই আপনারা চালান পান ? তা নয়, কিছু কাপড় সরিয়ে রাখা হয়।

তাই নাকি !—বোকার মত কৌতূহল প্রকাশ করে রতন ইচ্ছে করে।

কানাই হাত জোড় করে বলে,—মিছে কথা বললে জিব্ পাথর হয়ে যাবে হুজুর। এই আপনার পণ্ডিতই কত কাপড় যে চালান থেকে সরিয়ে রাখে, তা আর কে জানে বলুন! শত্তুর যদি ঘরে থাকে, তাকে ধরবেন কি করে বলুন ?

হুঁ !—রতন একটু চিন্তায় পড়ে,—কথাটা ত' একটু ভেবে দেখবার মত।

কানাইকে বলে,—তা তুমিই বা এত কষ্ট করে খবরটা আমায় দিতে এলে কেন ?

কানাই জেরার মুখে একটু থমকে যায়! তারপর বলে,—সত্যি কথা বলব হুজুর ?

বলো।

জোলাদের কাছ থেকে খবরাখবর সব ওকে আমিই এর আগে দিতুম! আমার সাহায্য না পেলে ও আজ এত বড় হতে পারত না কখনও। কতদিন বলে পাঠিয়েছি আজ বাইরে বেরোবেন না, জোলারা মারবে। আজ কাপড় নিতে যাবেন, নইলে সব ভাল কাপড়গুলো কিছু কিছু গাঁয়েই বিক্রি হয়ে যাবে। এমন কত খবর ও আমার কাছ থেকে পেয়েছে। অথচ আমি যখন জোলাদের কাছে ধরা পড়ে ওর কাছে আশ্রয় চাইলুম। তাড়িয়ে দিলে। বলে,—যেখানে খুসী মরগে যা। একটা কানাকড়িও দিলে না। সেই ত' হোল আমার রাগ। তাই ওর চুরীর কথা আজ আপনাকে বলছি, যাতে ওর শাস্তি হয়।

রতন কানাইয়ের কম্পিত গদ গদ কণ্ঠস্বরে একটু গলে যায়,—তা' হলে তোমার স্বার্থ এই যে ওর একটু ক্ষতি হলে তুমি আনন্দ পাও।

নিশ্চয়ই হুজুর। ওই ত' প্রথম শত্তুর হোল আমার। সাফ জবাব দেয় কানাই। কানাই রতনের চরিত্র ধরে ফেলেছে। এর কাছে স্পষ্ট কথা বললে সুবিধে হবে—এটা ও বুঝে ফেলেছে।

বেশ আমি এর ব্যবস্থা করব। রতন পকেট থেকে দুটো রূপোর টাকা বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘরে চলে যায়। যাবার সময় ও লক্ষ্য করে না যে চন্দ্রা এতক্ষণ বাড়ীর পাঁচীলের আড়াল থেকে ওকে আর কানাইকে লক্ষ্য করেছে।

ঘরে এসে তেষ্টা পায়। ঘরে জল নেই।

বাইরে এসে চন্দ্রার খোঁজে চারিদিক তাকায়। চন্দ্রা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে দাওয়ায় বসে কলাই বাছচে।

একটু জল দেবেন?

চন্দ্রা ঘোমটা আর টানে না। দু' এক দিনেই যেন রতন অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওদের বাড়ীতে। তাছাড়া বয়েস ত' বেশী নয় যে ভাসুর ঠাকুর বা কিছু মনে হবে!

চন্দ্রা তাকায় রতনের দিকে।

রতন আজ ভাল করে দেখতে পায় চন্দ্রার মুখ, একটু চাপা নাক, বড় বড় চোখ আর গালে দুটো টোল্ পড়ে হাসলে। সব মিলিয়ে মুখখানা খুসি-খুসি।

চন্দ্রা রতনের দিকে তাকায় মুখ তুলে। তারপর জল আনতে ঘরে যায়। বাইরে জল নিয়ে এসে দেখে রতন বাইরে নেই। জল চেয়ে মানুষটা গেল কোথায়। এদিক ওদিক খুঁজে কোথাও পায় না। ঠিক এমনি সময় সামনের ছোট মাঠটুকু থেকে ভেসে আসে বাঁশীর সুর। পুরিয়া সুরে তান ধরেছে রতন।

পাঁচীলের বাইরে আসে চন্দ্রা। ঘোমটা মাথায় একটুখানি। খোঁপায় আটকানো। হাতে এক গ্লাস জল।

ওই ত রতন বসে আছে হোথায়। অবিন্যস্ত চুলগুলো কপালের ওপর পড়ছে উড়ে উড়ে। পাতলা ঠোঁটের কাছে বাঁশী ধরেছে। আঁড় বাঁশী। পুরিয়ার কোমল পর্দাগুলো বাঁশীর সুরে যেন ভেসে আসছে আগত সন্ধ্যায় রক্তিম মরিচী-মালীর বিদায় বেদনার ভাষা নিয়ে।

স্থান কাল ভুলে যায় চন্দ্রাবতী।

হাতের গ্লাস নিয়ে পাঁচীলে হেলান দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

রতন তৃষ্ণা ভুলে গেছে। অন্তরের তৃষ্ণার মধু পান করছে ও।

সূর্য অস্ত চলে যায়।

৮

রতনমনি চলে গেল সদরে।

একরামপুরে একবার এলও না। মোড়ল গুপীনাথ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন।

সনকাপুরের হাটে চালান দেবার কাপড়গুলো প্রহ্লাদ লুকিয়ে রাখতে চায়নি শেষ পর্যন্ত। বলেছিল,—আমি ও কাজ পারব না।

কেন রে?—গুপীনাথ বোঝাতে যাচ্ছিল।

প্রহ্লাদ তবু শুধু ওই একই কথা বলেছিলো,—না, পারব না আমি।

গুপীনাথ একটু অসন্তুষ্ট যে হয়নি তা নয়। প্রহ্লাদ কখনও তার কোন কথার

ওপর জবাব দেয় নি; কিন্তু আজ মুখের ওপর পারব না শুনে একটু বিরক্ত হয়েছিলো। তবু সময় বড় খারাপ জোর করতে সাহস করেনি। অন্য সময় হলে গুপীনাথ মোড়লের কথার অবাধ্য হওয়া মানে গ্রাম ছাড়া হওয়া কিন্তু আজ তার সে জোর কোথায়। শুধু একটা নিশ্বাস ফেলে বলেছিলো,—সবই তোরা আমার ওপর চাপাবি। আমার একার কাজ ত' নয়?

প্রহ্লাদ চুপ করে চলে গেল।

গুপীনাথের বাড়ীতেই লুকোন রইল কাপড়ের গাঁট।

রতনমনি চলে যাওয়ার পর প্রহ্লাদ শুধু বললে নীরুকে একদিন,—কাপড়ের গাঁটগুলো লুকিয়ে রাখলে কিছুই ক্ষেতি হোত না। শুধু শুধু মোড়লের মুখের ওপর জবাব করতে হোল আমায় তোর জন্যে।

নীরু বলেছিল,—থাক্, এখন আর চোপা করতে হবে না। নিজে ত' ভয়ে ভয়ে রাখলে না। এখন আমার ওপর যত দোষ চাপান হচ্ছে।

প্রহ্লাদ অবাক। কথা না বলে সুতোয় মাড় দিতে লাগল।

নীরুও একটু হেসে চলে গেল। ক্ষেপাতে গিয়েছিল নীরু ওকে। কিন্তু ও ক্ষেপল না। আজকাল যেন অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে প্রহ্লাদ।

কানাইয়ের আর দিন চলে না। নিজে রোগা দুর্বল যা সামান্য কাপড় বুনতে পারে, তাতে থাকোমণির খাওয়া আর চলে না। থাকোমণি এখন যেন ঘুমের চেয়েও খায় বেশী। ছেলে ত' একটা হোল বলে। কিন্তু ছেলে হলে যে কি করে চলবে ভগবানই জানে। কাপড় বেচে এখন যা পায় পণ্ডিতের মারফত তাতে দিন চলা ভার। সব জিনিষেরই যেন কিছু কিছু দর বেড়ে গেছে আজকাল। কাপড়ের দর না বাড়লে তাদের চলে কি করে?

বাজার যেন আগুন!—ভোজরাজার ব্যাটা নীলকেষ্ট একটু নেংচে বলে উঠল। আর ত' চলে না ভাই। পাঁচ সের চাল দিতে পারিস আজ? পরশু দিয়ে দোব।

কানাই কোত্থেকে চাল দেবে? ওরই ত' কুলোয় না থাকোমণির খাবার বহরে তিন থালা ভাত এক এক বারে খায়—দিনে রাতে তিন বার। কি রাক্ষসই বিয়ে করেছিল কানাই। কানাই বলে মাথা চুলকে,—কোথায় চাল পাব ভাই।

দে না, ভোজরাজের দোহাই পরশু দিয়ে না দিই ত'—। কাল থেকে প্রায় নিরম্বু উপোস চলেছে, বিশেস কর।

কানাইয়ের অগত্যা রাজী হতে হয়,—ঠিক পরশু দিবি ত' ?

নীলকেষ্ট একটু লেংচে আর একবার ভোজরাজের দিব্যি করে।

কানাই শুধোয় চাল কোঁচার খুঁটে ওকে ঢেলে দিয়ে,—ভোজবাজী দেখিয়ে কি কিছু পাস না আজকাল ?

কই, আগেকার মত আর হয় কই ? সব যেন কেমন পাথর মেরে গেছে। খেলা ধুলো ভোজবাজী কিছু দেখতে চায় না তেমন। দুর শালা এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব। গেল মাসে মোতিপুরের বাবুদের খেলা দেখালুম, কিন্তু তেমন যেন জমল না। পয়সা যা পেলুম তাতে আবার এটা কিনি ত' ওটা হয় না, ওটা কিনি ত' এটা হয় না। কি হোল বলত' কেনো ?

কানাইয়েরও ত' ওই প্রশ্ন, কি হোল।

ওরা আর জানবে কি করে যে দেশের শিরায় শিরায় প্রতিটি জিনিষের ওপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোলুপ নজর পড়েছে, তারা শিরায় শিরায় চালান করছে তাদের জন্মগত ব্যবসায়ের বিষাক্ত রক্তের স্রোত। ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাজারের বনিয়াদ।

কানাই জানছে বাজার আগুন হচ্ছে দিন দিন, হয়ত বা এমনিই কিংবা প্রকৃতির খেয়ালে।

জানে শুধু এই গ্রামগুলোর ভেতর একজন—সে জমীদার চন্দ্রকান্ত। মাঝে মাঝে গভীর নিশীথে জলসা ঘরে বসে আরক্ত চোখের সামনে যেন দেখতে পায় বাঈয়ের ঘাগরার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে দেশের এতদিনের জমীদারী জীবন। লোভের লালায় পিছল হয়ে ঘুরে যাচ্ছে জীবনের প্রয়োজন সর্বত্র।

চন্দ্রকান্ত মাঝে মাঝে মুচকী হাসে শুধু। আবার কোহলের নেশায় ডুবে যায় বুঁদ হয়ে।

বেশ কিছুদিন এইভাবে কাটতে থাকে। অভাবে অভিযোগে চোরাই চালানে কোম্পানীর চালানে একরামপুরে সুস্থ জীবন যেন তেঁতো লাগে ক্রমশঃ।

তবু এখনও পেটে ভাত আছে। বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা আছে। জীবনের ছন্দপতন সম্পূর্ণ হয়নি বলেই হয়ত এরই ভেতর কোথায় মনের আস্বাদ মেলে।

গুপীনাথের মোটা ভাইপো গদাইয়ের সঙ্গে টুকুর গোপন আলাপের কথা কিছু জানাজানি হয়ে কানে আসে গুপীনাথের। মাধাই ও সবের ভেতর নেই। তাঁত বোনে, খায়—আর ঘুমোয়। গুপীনাথের বাড়ীর পিছনে কচুবনের ভেতর দিয়ে একখানি রাস্তা গেছে বরাবর খানখানা তলায়।—খানখানা তলার পুকুরেই এ দিককার সব মেয়েরা আসে জল তুলতে চান করতে। সন্ধ্যার দিকে নাকি গদাইকে দেখা গেছে ওই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মনোহর তাঁতির ছোট মেয়ে টুকুর আঁচল চেপে ধরতে। টুকু নাকি তখন গা ধুয়ে এক কলসী জল নিয়ে ফিরছিল। বহুদিন থেকেই গদাই টুকুকে বাঁ পাশে নিয়ে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখছিল। টুকুও যে জানত না তা নয়। কিন্তু গদাইয়ের মাথা চুলকাণী আর জিভে আটকে যাওয়া কথা শুনত আর হাসত মুচকী মুচকী। গদাই সেদিন দুপুরে টুকু ওদের বাড়ী যখন বেড়াতে এসেছিল, তখন দু তিন গ্লাস জল খেয়ে গলা সাফ করে অনেকবার মহড়া দিয়ে বলে ফেলেছিল, তোমাতে আমাতে বেশ মিলতি মেলে,—না ?

টুকু শুনে মুখ রাঙা করে ছুটে পালিয়েছিল।

ব্যস্। গদাই ভাবলে হয়ে গেছে। এবার একদিন চেপে ধরলেই হবে।

তাকে তাকে থেকে সেদিন সন্ধ্যায় ঝোঁপ বুঝে এমন কোপই মারলো যে টুকু যদি চেঁচাত তবে মনোহর তাঁতির তিন ছেলের সড়কির ডগায় ওর নেয়াপাতি ভুঁড়িটা বিঁধে যেত। আঁচল ধরে টানতেই টুকু গদাইকে ফিরে দেখে একটুও শব্দ না করে ছুটে পালিয়েছিল বাড়ীতে। বাড়ীতে এসে আধঘণ্টা হাঁপিয়ে জিরিয়ে তারপর মাকে বলেছিল—সব, একটু অবশ্য—রেখে ঢেকে।

মনোহর শুনলো তার স্ত্রীর কাছ থেকে। অন্য কেউ হলে তাকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনত ;

কিন্তু মোড়লের ভাইপো। কাজেই কথাটা গুপীনাথকে জানানই স্থির করলে।

গুপীনাথ সমস্ত শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—একটা কাজ করলে হয় না মনোহর ?

মনোহর বলে।—বলুন।

—ছুটোকে ধরে বিয়েই দিয়ে দাও না।

মনোহর হাতে স্বর্গ পায়। মোড়লের ভাইপো তার মেয়েকে বিয়ে করবে এত সৌভাগ্য তার ?

মুখে বলে,—আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

—তাই করো। দিন দেখো। ওর বিয়ে দিয়ে দেয়াই ভাল। বিশেষ করে কথাটা যখন গাঁয়ে রটে গেছে।

মনোহর আনন্দে ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে জানায়।

গদাই প্রথমটা খুব ভয় পেয়েছিল যে সবাই তার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। কিন্তু যখন শুনল যে খুড়ো তাকে গুরুতর শাস্তি দেবার বদলে বিয়ের কথা বলেছে তখন গদাইয়ের মনের অবস্থাটা ওর কম্পমান ভুড়িটুকু থেকেই অনুমান করা যায় মাত্র।

টুকুরও যে আনন্দ হয়নি তা নয়। তবু ওর একটু ভয় হয় যে ফুলসজ্জার রাত্রে যদি গদাই ওকে চেপে ধরে ত' ও দম ফেলতে পারবে কিনা।

যাই হোক। গ্রামে এমন একটা মজার বিয়েতে সবাই কিছু কিছু টিপ্পনী ছাড়ে। একটা হালকা আনন্দের স্রোত যেন আবার বয়ে যায় সমস্ত একরামপুর গ্রামটায়। তাঁতিদের ভেতর মনোহরের অবস্থা ভাল। কাজেই সে বিয়েতে গ্রামের সবাইকেই বলবে বলে ঠিক করে। গুপীনাথও দাদার অবর্তমানে দাদার ছেলের বিয়েতে যথোচিত খরচ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসে।

বিয়ের চিন্তায় টুকু যেন এই কদিনেই বেশ ফুলো হয়ে উঠে; আর গদাই অধৈর্য হয়ে প্রতিক্ষণ গুনতে গুনতে খাওয়া নাওয়া ভুলে কিছু রোগা হয়।

বিয়ের দিন হৈ হৈ ব্যাপার মনোহরের বাড়ী।

গায়ে হলুদে গুপীনাথের বাড়ী মেয়েদের ভিড়ে গিজ গিজ করে। আশে

পাশে এগাঁয়ে ও গাঁয়ে যত আত্মীয় স্বজন। এমন কি লোচন পণ্ডিত চন্দ্রার জন্যেও সিধে পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়। তারা ব্রাহ্মণ, তারা ত আর তাঁতিবাড়ী এসে খাবে না। চন্দ্রা কিন্তু একবার বিয়ে বাড়ী ঘুরে যেতে চায়। লোচন ধমকে বারণ করে—মান সম্মান নেই? যাঁরা আমায় দেখে এখন ভেড়ার মত কাঁপে, তার বাড়ী গিয়ে—বিয়ে দেখতে যাবে লজ্জা করে না।

—না!—চন্দ্রার ভারি সখ। বিয়েটা এমন মজার। না দেখে কিছুতেই থাকতে পারবে না। চন্দ্রার অনেক চোখের জল খরচ করবার পর পণ্ডিত বলে,—তবে যা খুসী করোগে। চোখ মুছে চন্দ্রা সাজগোজের বন্দোবস্ত করতে যায়।

বিয়ে বাড়ী চন্দ্রা আদর পায়। সবাই হয়ত তার সঙ্গে ভান করে কথা বলত না। কিন্তু চন্দ্রাই সেধে প্রথমে সকলের সঙ্গে কথা বলে। অগত্যা সবাইকেই কথা বলতে হয়। টুকুকে চন্দন পরিয়ে সাজাবার ভার নেয় চন্দ্রা। জামাইকে বরণ করবার ভার নেয় চন্দ্রা। খয়েরের বাগান তৈরী করবার ভারও ওরই ওপর পড়ে। ক্রমশঃ রীতিমত মুখর হয়ে ওঠে ও।

টুকুকে একসময় বলে,—আমি সেধে এসেছি কেন জানিস্?

—কেন? টুকু বোকা বোকা চোখ মেলে শুধোয়।

—তোর ভাগ্যি দেখতে। পীরিত করে বিয়ে করা ত' সবার বরাতে হয় না লো?

টুকু নিদারুণ লজ্জায় মুখ নীচু করে।

ঠাট্টা করে বলে চন্দ্রা একগাল হেসে—ওমা। আবার লজ্জা কিসের লো? আমরা হলে ত' দেমাকে পা ফেলতুম না মাটিতে। পরাণের নাগর ঘরে এলো!—

বলে নিজেই অজস্র হাসতে থাকে। টুকুর সঙ্গে গদাইয়ের পূর্বে প্রেম ছিল এমন একটা কল্পনা সকলে করে নিয়েছে। চন্দ্রা কিন্তু কল্পনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। সেটা নানাভাবে ব্যাখ্যা করে যেন নিজেই ভারী আনন্দ পাচ্ছে। এই রসটুকু উপভোগ করবার জন্যেই ত' আজ আসা। চন্দ্রা বয়স যেন অনেক

ক্রমে এক অনূঢ়া যুবতীর পর্য্যায়ে নেমে এসেছে, নিজেকে টুকুর সঙ্গে এক করে কল্পনা করে মনের কোন একটা গোপন স্থানে ও উপভোগ করছে টুকুর প্রথম প্রেমের সবটুকু রোমাঞ্চ।

চন্দ্রার মনের ময়ুর পাখা মেলেছে। আজ নয়—কত দিন গত হয়ে গেল পণ্ডিতের প্রৌঢ় রসিকতায় আর অর্থ কৃচ্ছতায় ওর প্রাণটা যেন এতদিন কাঠের মত শুকিয়ে ছিল। ও ভাবতেই পারেনি যে টুকুর মত বয়েস ওর ছিল। পণ্ডিতের বালির কবরে চাপা পড়ে ছিল সে যৌবন। চোরাবালি বুঝি বা ধ্বসে গেছে। ও দেখতে পেয়েছে নিজের প্রেমকে। আর যে ওকে দেখিয়েছে যে ও নারী। সে কে? সে কথা আজ থাক। চন্দ্রা নিজেকে ঢেলে দেয় যেন। কেউ পর নয়। কারো সঙ্গে শত্রুতা নেই। সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলছে। পান খাচ্ছে আর বেড়াচ্ছে ফুরফুর করে। চন্দ্রা আজ যেন অনেক হাল্কা।

নীরুর কিন্তু ভাল লাগে না চন্দ্রার এই ভাব ভঙ্গী। বামুন পণ্ডিতের বউ। বয়েস হয়েছে। তার আবার ঢঙ কেন? নীরুর গায়ে যেন জ্বালা ধরে। গায়ে জ্বালা ধরবার কারণটা অবশ্য শুধুই চন্দ্রার ওপর রাগ তা নয়। ওর অবচেতন মনে বহুকাল আগের কতকগুলো কথা আবছা আবছা পাক খায়। ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু একটা অনর্থক অস্বস্তি বোধ করে মনে। রাগ হয় সকলেরই ওপরই যেন। এত নাচানাচির কি হয়েছে! বিয়ে কি আর কারো হয় না!

ওই সব ঢঙ ঢলানীর দিকে ও এগোয় না। একগাদা বাটনা নিয়ে বাটতে বসে যায়। বাটনা বাটতে বাটতে ডানা দুটো যত ব্যথা করে, ও তত জোরে বাটনা বাটে। যেন নিজের ওপর একটা আক্রোশে নিজেকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয়। বাটনা বাটা হয়ে গেলে মাজা বাসন নোংরা হয়েছে বলে বকবক করতে করতে মাজতে নিয়ে যায়। জোরে জোরে বাসন মাজে।

কানাইয়ের বউ বাচ্চা কোলে করে এসেছে। থাক্কোমণি। সবে আঁতুর থেকে বেরিয়ে আসবার কোন দরকার ছিল না। তবু এসেছে টুকুর বিয়েটা

একটু অন্যরকম কিনা ? তাছাড়া গুপীনাথ মোড়লের সঙ্গে মনোহর তাঁতির কাজ। এ যেন রাজায় রাজায় বিয়ে।

ওঃ। ঠোঁট ফুলে ওঠে নীরুর। যেন রথ দোল লেগে গেছে! বিয়ে আর কারো যেন হয় না! আদিখ্যেতারও একটা সীমা থাকা চাই।

—তুমি কেন কাঁচা নাড়ীতে এলে বাছা।—থাকোমণিকে না বলে পারে না নীরু।

থাকোমণি একটু হেসে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।

দেখে সর্বাঙ্গ জলে যায় নীরুর। আ মরণ! ছেলেকে আদর করবার সময় পেলে না!

কখন ওরই ভেতরে মনের ভেতর একটা কথা বিঁধে গেছে।—তার যদি একটি ছেলেও থাকত! ওখান থেকে হন্ হন্ করে চলে আসে নীরু রান্নাঘরের দিকে।

বেলা প্রায় তিনটের সময় সব রান্না শেষ হয়। নিমন্ত্রিতরা সব একে একে বসে যায়। তাদের খাওয়া শেষ হতে হতে রাত্রি। কম ত' নয় সমস্ত একরামপুর গ্রামখানা ঝেঁকে এসেছে। তাছাড়া এ গাঁ ও গাঁয়ের মানুষও ত' আছে কিছু কিছু।

রাত্রে সবাই চলে যাবার আগেই প্রহ্লাদকে বলে পাঠায় নীরু—সে যেন চলে যায় না। নীরুকে নিয়ে যেতে হবে। প্রহ্লাদ পান চিবোতে চিবোতে গদাইয়ের পাশে বসে তামাসায় সায় দিচ্ছিল। নীরু কথাটা সকলের সামনে একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে বলে পাঠায়। ও একটু যেন লজ্জায় পড়ে যায়। ভাগ্যি সেটা আর কেউ লক্ষ্য করে না।

রাত্রি অনেক হয়ে আসে। বিয়ে হয়ে গেছে। নীরু একখানা সাদা চাদর মুড়ে বাইরে চলে আসে। প্রহ্লাদ শুধোয়,—তোর ভাই যাবে না ?

—ও চলে গেছে ?—বলে এগোয় নীরু।

বিয়ে বাড়ীতে শুধু দিন রাত খেটেছে নীরু। কিছুই খায়নি। আগে প্রহ্লাদের নজর পড়ে ওর মুখের দিকে। মুখখানা নীল হয়ে ছোট হয়ে গেছে—শুকিয়ে। চুল আগোছাল। চোখদুটো যেন কোটরে ঢুকে গেছে।

প্রহ্লাদ শুধোয় ;—অসুখ করেছে না কি রে ?

ম্লান হেসে বলে নীরু,—না।

—তবে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

উত্তরে আবার একটু হাসে নীরু। কথা বলে না প্রহ্লাদ আশা করেছিলো উত্তরে অন্তত একটা ধমক খাবে। কিন্তু নীরুকে নির্বাক দেখে ও অবাক হয়ে যায়।

অন্ধকারে ওরা বাড়ীমুখো এগোয় ;

সরু মাটির রাস্তা। দুধারে ছোট ছোট ঝোঁপ—ঘাস। কোথাও কোথাও বা ঘন জঙ্গল। দুজনেই নীরবে পথ চলতে থাকে।

একটা খাটাস বোধ হয় শব্দ করতে করতে সামনে একটা জঙ্গলে ঢুকে যায়

নীরু সরে এসে হাত চেপে ধরে একখানা প্রহ্লাদের।

কিরে ভয় পেলি ?—প্রহ্লাদ ওর ঠাণ্ডা হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করে।

উত্তরে নীরু ওর কাছে আরও ঘেঁসে আসে শুধু।

প্রহ্লাদ ওর হাত ধরেই চলে।

কালো! ·

নীরুর গলাটা প্রহ্লাদের কানে অস্বাভাবিক ঠেকে! এ নামে ত ঠাট্টা করে ছাড়া নীরু তাকে বড় একটা ডাকে না। তাছাড়া আজ ওর গাটাও যেন কেঁপে ওঠে একটু।

—কিরে ?

নীরুর গলাটা বন্ধ হয়ে আসে, বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে,—আজ ভর দিনটা কি করে যে কেটেছে!

—কি হয়েছিলো ?

—কি জানি।—আর কথা বলতে পারে না নীরু।

প্রহ্লাদ কথা বলে না। শুধু ওর হাত খানা ওর হাতের ভেতর অনুভব করে অন্ধকারে! নীরুর হাতটা কাঁপছে। হাত কাঁপছে কেন? প্রহ্লাদ তাকাতে চেষ্টা করে ওর দিকে। চাদরের খুঁটে চোখ মোছে নীরু। প্রহ্লাদ বিস্মিত ব্যথিত হয়ে বলে,—তুই কাঁদচিস নীরু ?

নীরু এবার শব্দ করে কাঁদে। সমস্ত দিনের জমাট বাষ্প যেন ওর মন থেকে গলে গলে পড়ে। প্রহ্লাদ কি করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর হাতটা ভাল করে চেপে ধরে, ওর মাথায় হাত বুলোয়।

নীরু প্রহ্লাদের হাত খানা টেনে নেয় নিজের মুখের ওপর। ওর চোখের জলে প্রহ্লাদের হাতখানা ধুয়ে যায়। অনেক পরে আবার চোখ মোছে নীরু। পথ চলতে থাকে।

প্রহ্লাদও পথ চলে,—কি হোল তোর ?

—কিছু না।—গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলে নীরু।

ততক্ষণে ওরা বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়ে।

গভীর নীল আকাশে কিছু কিছু নক্ষত্রের ভীড়। প্রহ্লাদ একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু বলবে বলবে করেও কিছু বলতে পারে না। আজকের রাত্রিটি ওর জীবনে খুবই স্মরণীয়। তার চেয়েও স্মরণীয় নীরুর আজকের ব্যবহার।

জাঁহাবাজ মেয়ে নীরুও কাঁদতে পারে এ ধারণা ছিল না প্রহ্লাদের। বরাবরই ধমক ঠাট্টা পেয়ে পেয়ে প্রহ্লাদ নীরুকে পাষাণ ভেবেছিলো এতদিন। পাষানেও যে এত ব্যথা আছে কে জানত !

সুগভীর তৃপ্তি অপরিমিত বিস্ময় মনে নিয়ে ও ঘরের দিকে এগোয়।

নীরুও নিজের ঘরের দিকে এগোয়।

সে রাত্রি ঘুম হয় না প্রহ্লাদের। নানা রঙীন্ তাঁতের সুতোর বুনোনির মত ওর মনে চিন্তাগুলো জড়িয়ে যায়। অভূতপূর্ব এক মধুময় অভিজ্ঞতা ওর জীবনে হোল, এ অনুভূতি ওর আরও বাড়ে। যতই ও নিজের ডানহাতখানা দেখে আর ভাবে যে এই হাত খানাই ভিজে উঠেছিল নীরুর চোখের জলে। নীরুর মুখখানা ছিল চাপা এই হাতে।

নীরুরও সে রাত্রি ঘুম হয় না। যত রাগ হয়েছিলো ওর প্রহ্লাদের ওপর। ভেবেছিলো বাড়ী যাবার পথে খুব বকবে আজ ওকে। জীবনের সব নষ্ট করেছে ওর ওই কালো। কিন্তু কি যে হয়ে গেল। নীরুও যেন ভাল করে বুঝতে পারলো না।

এমন দুর্বলতা যে নীরুর আসবে এত স্বপ্নে নীরুও ভাবতে পারে না। তবু কালোর কাছে আজ প্রাণের অনেক চাপা বাষ্প চোখের জলে ঢেলে দিয়ে হালকা বোধ করছে নীরু। বুকটা এতদিন যেন অস্বাভাবিক ভারী হয়েছিলো। আজ থেকে থেকে সেখানে অনুভব করছে আনন্দের গভীর বোধ।

কিন্তু কালো কি ভাবলে?

যা ভাবে ভাবুক। ভাবাতেই ত' ওকে নীরু চায়। নিজে মারামারি করবে খাবে দাবে বেড়াবে আর যত ভাবনা বয়ে বেড়াবে নীরু একা? আর তা' চলবে না।

নীরু চোখের পাতা ফেলতে পারলো না সে রাত্রে।

কোথা দিয়ে রাত ভোর হয়ে গেল কে জানে! পরদিন খুব ভোরে উঠেই আবার যেতে হবে বাসী বিয়ের বাড়ী।

পাশ ফিরে শোয় নীরু।

৯

আবার এলো রতনমণি। প্রায় মাস দেড়েক পরে। এবারে বোধহয় কিছু গুরুতর কাজ নিয়েই এসেছে। ব্যাগে অনেক কাগজ পত্র। মুখখানাও কিছু গম্ভীর। এবার যে শুধু বেড়াতে আসা নয়—এটা টের পেলো লোচন পণ্ডিত।

শুধোলো রতনমণিকে,—ছোট বাবু কি একরামপুরে যাবেন এবার?

রতনমণি গম্ভীর স্বরেই বলে,—না, কাল একবার জমীদার বাড়ী যাবো। সকালেই।

চন্দ্রা এবার আর ততটা ঘোমটা দিলো না ওকে দেখে। বলল পণ্ডিতকে,—সব সময় জল খাবার এটা ওটা দিতে হয়। ঘোমটা দিয়ে ত' আর বোঝা যায় না ওর কি দরকার।

পণ্ডিত হেসে বললে,—না, না, ওকে দেখে ঘোমটা দেবার দরকার নেই।

ও ত' বাচ্চা ছেলে! তুমি ওর সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে পারো। ছেলেটি ভাল।

চন্দ্রা সায় দেয়,—সত্যিই খুব ভাল।

পণ্ডিত বলে তবু,—একটা চাকর রাখব দিন কতকের জন্যে?

—না, আর চাকরে কাজ নেই। সে পয়সাটা বরং অন্য কাজে লাগবে।

পণ্ডিত খুসী হয়। চাকরের কথা চন্দ্রা বললে পণ্ডিতও বলে কিনা সে পয়সাটা অন্য কাজে লাগবে!

রতনমণিকে সন্ধ্যায় জল খাবার দিতে এসে ভেবেছিলো চন্দ্রা হয়ত ওকে পাবে না ঘরে—।

দেখবে সামনের ছোট মাঠটায় বসে আছে বাঁশী হাতে। কিন্তু না। আজ হাতে কলম।

সামনে কাগজ পত্র ছড়ান। চন্দ্রা কপাল অবধি ঘোমটা দিয়েই এসেছিলো। জল খাবার তক্তপোষের সামনে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। তবু রতনমণির খেয়াল নেই। লেখাপড়ায় ব্যস্ত!

—খেয়ে নিন।

রতনমণি চোখ তুলে তাকায়। চন্দ্রার মুখ খানায় ঘোমটা না দেখে যেন ভারী খুসী হয়।

কাগজ এক পাশে ঠেলে একটু হেসে বলে,—বড় খুসী হলুম বৌদি। আপনি আজ আমাকে দেখে অনর্থক লজ্জা করলেন না কথা বলতে। আপনাকে বৌদি বলেই ডাকব। রাগ করবেন না ত'? মুখটা একটু নীচু হয়ে যায় চন্দ্রার। মাথা নেড়ে জানায়। রাগ সে করবে না।

রতনমণি ঘরের তৈরী সন্দেশ দুটো মুখে তোলে। তারপর পান্তুয়া। তারপর ক্ষীরের সাজ।

সবকটা মিষ্টিই খেয়ে ফেলে রতন। জেনেও একবার শুধোয়,—সবই কি বাড়ীর তৈরী। বড় সুন্দর হয়েছে ত'!

জল খায় রতন।

চন্দ্রা এতক্ষণে হালকা হয়ে একটু হাসতে পারে,—হ্যাঁ সব ঘরে তৈরী। কেন বাড়ীতে এ সব খান না? মা তৈরী করে দেন না?

—মা নেই।—রতন একটু ম্লান হেসে জবাব দেয়,—বোন ছিল দুটো। বিয়ে হয়ে সব শ্বশুরঘরে চলে গেছে।

—কে রান্না করে তবে?—চন্দ্রা এবার মেয়েলী আলাপ জুড়ে নেয়।

রতনও খুসী হয়েই জবাব দেয়,—একটি চাকরাণী আছে। কাজ রান্না সবই সে করে। সেটা আবার খুব বুড়ী। মায়ের আমলের।

চন্দ্রা বলে,—তাকে দিয়ে ত' করাতে পারেন এটা ওটা যা খেতে ইচ্ছে হয়।

রতন হাসে,—কি খেতে ইচ্ছে হয় তাই কি ছাই জানি যে বলব! আচ্ছা, এবার আপনার এখানে খেয়ে গিয়ে বলব, যা যা খেলুম সব তৈরী করতে। তাও বোধহয় পারবে না। বয়েস হয়ে গেছে। কাজ রান্না মোটামুটি করে ঘুমুতে পেলে বাঁচে। হয়ত কোনদিন উনুনে ভাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে শীতকালে। ভাত পুড়ে আঙার হয়ে গেছে। আবার ভাত রাঁধে, তবে খাওয়া হয়।

শুনে চন্দ্রার ভারী মায়া হয়। এত টাকা অথচ ভাল করে খেতে পায় না বাড়ীতে গিন্নির অভাবে। বলে,—আপনার বাবারও ত' খুব কষ্ট হয়। বুড়ো মানুষ একটু সেবা যত্ন—!

—তা হয়! তবে কি জানেন, অভ্যেস হয়ে গেলে সয়ে যায়। তাছাড়া আজ ত' কম দিন নয়। মা মারা গেছেন আজ প্রায় আঠারো বছর।

চন্দ্রা বলে,—আপনারা কি বরাবরই সহরে?

—প্রায় বরাবর। বাবার আমলে সহরেই কেটেছে। ঠাকুর্দা ছিলেন দেশে গাঁয়ে।

চন্দ্রা মুখটা খুব গম্ভীর করবার চেষ্টা করেই বলে,—তবে ত' আপনার বাবার কষ্টের জন্যেও আপনার বিয়ে করা দরকার।

—করলেই হোল।—রতন একটা ঢেঁকুর তুলে জবাব দেয়।

ওর জবাবের ধরণে হেসে ফেলে চন্দ্রা। ইতিমধ্যে পণ্ডিত ঘরে ঢোকে,—কি কথা হচ্ছে?

বাইরে থেকে পণ্ডিত বেরিয়ে এলো রতনমণির আগমন বার্তা সর্বত্র ঘোষনা করে।

চন্দ্রা হাসতে হাসতেই একটু ঘোমটা টানে অভ্যাস বশতঃ।

রতন হেসে বলে পণ্ডিতকে,—বৌদি বলছিলেন যে বাড়ীতে ত' মা নেই, কেউ নেই। খাবার দাবার কষ্ট হয়, তাই আমার একটা বিয়ে করা দরকার। তা' পণ্ডিত মশাই একটা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখুন না?

চন্দ্রা খিল খিল করে হেসে উঠে এবার।

পণ্ডিত বলে,—না, না, হাসবার কথা নয়। সত্যিই করবেন বিয়ে?

কেন কোরব না। চারটে করতে রাজী আছি। একটা পা টিপবে, একটা মাথা টিপবে, একজন রান্না করবে। একজন অন্যকাজ করবে।

চন্দ্রা হাসতে হাসতে মুখে আঁচল গোঁজে।

পণ্ডিত এবার হাসবার চেষ্টা করে,—তবে ঠাট্টা করছেন?

রাম রাম, ঠাট্টা কোরব কেন, দেখুন না, ভাল মেয়ে যদি পাওয়া যায়।

বেশ জানা রইল।

রতন এবার অন্যকথা পাড়ে,—কাল একটু সকাল সকাল জমীদার বাড়ী যেতে হবে পণ্ডিত মশাই। ভোরে উঠতে পারবেন ত'? না হয় বৌদি উঠিয়ে দেবেন।

পণ্ডিত হাসে,—কি যে বলেন, আমারই ওকে টেনে ওঠাতে হয়।

চন্দ্রা কপট ক্রোধ প্রকাশ করে,—মিছে কথা বোল না বলছি?

মিছে কথা!—পণ্ডিত চটে যায়,—বলত' ভগবানের নাম করে—।

আহা হা, আবার ভগবান কেন?—রতন থামিয়ে দেয় ওদের।

চন্দ্রা চলে যায় ঘর থেকে।

রতন বলে এবার পণ্ডিতকে,—শুনুন খুব জরুরী কাজে এসেছি এবার। কোম্পানীর চন্দনডাঙ্গার যে জমীটা কেনা আছে, সেখানে কুঠি তৈরী হবে শিগ্‌গিরই। কথাটা এখন কাউকে না জানানই ভাল।

কুঠি!—পণ্ডিতের চোখ কপালে ওঠে, কিন্তু তবু হাসবার চেষ্টা করে বলে,—তা বেশ ত'! আমার কাউকে বলতে যাবার কি দরকার?

কেউ যেন এখন জানতে না পারে। আগামী সপ্তাহে আমি আসব আবার। এসে কিছুদিন আমায় থাকতে হবে। কুঠিটা তৈরীর দেখা শুনা আমারই করতে হবে কিনা? বলতে বলতে পঞ্চাশটা টাকা বার করে রতন বলে,—এ টাকা কটা রাখুন, আমার খরচাপত্র আছে ত'?

—একি বলছেন। আপনার খরচার জন্যে টাকা—।

—তাহলে আমার থাকা হবে না পণ্ডিতমশাই। অন্য কোথাও চলে যাব। নিন ধরুন।

অগত্যা পণ্ডিত টাকা কটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে ভাবে। কুঠি যদি হয় তবে ত' আরও অনেক টাকাই এমনধারা পাওয়া যাবে। কেননা থাকতে ত' রতনমণিকে এখানেই হবে!

—তা ছাড়া—বলে রতন,—জমীদার বাবুর বগুড়ার একটা মহল কিনে নিচ্ছি আমরা। এ কথাটাও বলবেন না কাউকে।

—ক্ষেপেচেন! কাকে আর বলব। কেই বা আমার আপনার লোক আছে?

রতন আবার কাগজ পত্রে ঝুঁকে পড়ে।

পণ্ডিত টাকাটা আর একবার স্পর্শ করে অনুভব করে ট্যাঁকে, তারপর ওটা এখুনী চন্দ্রা রান্নাঘরে থাকতে থাকতে সিন্দুকে তুলে ফেলতে চলে যায়।

১০

ভয়ে ফাঁকাসে হয়ে গেল সমস্ত একরামপুর এলাকার মানুষ। রেশম কুঠি হবে চন্দনডাঙার পশ্চিমের মাঠে। সায়েব আসবে, থাকবে সিপাই আর পাইক বরকন্দাজ। সর্বনাশা নীল কুঠি কাহিনী কিছু কিছু গল্পের মত কানে আসত সকলেরই। রেশম কুঠির নামে সমস্ত এলাকাটা যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে। গাঁয়ে বাঘ এসেছে শুনলেও এতটা চমক লাগত না। এত ভয় হোত না শুনত যদি বন্যায়

ভেসে গেছে সব। কুঠি যেন এদের চেয়েও মারাত্মক। কুঠির সায়েব বাঘের চেয়েও ভয়াবহ।

রতনমণি জমীদারের সঙ্গে সামান্য কথা বলেই চলে গেছে এবার। কুঠির খরচার দরুন জমীদারকে কিছুই দেয়া হবে না জানিয়ে গেছে। তবু জমীদারের লোকজন না হলে কুঠি তৈরী করতে বেগ পেতে হবে। সেজন্যে কোম্পানী হাজার-খানেক টাকা জমীদারকে আরও কিছু জমীর জন্যে দেবে বলেছে। এটা জমীদারকে খুসী রাখবার জন্যে। এ ছাড়া বগুড়ার মহলটা কিনে নেবে নীলমনি তরফদার যদি ছ' হাজারে দেয় সেটা জমীদার চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্রকান্ত অনেকক্ষণ আলবোলা টেনে বগুড়ার জমীর সাড়ে ছ' হাজার আর কোম্পানীর কাছ থেকে একহাজার নিতেই রাজী হয়। শুধু জানতে চায় কুঠি তৈরীর ভার নেবে কে? রতনমণি জানায় যে সেই ভার নেবে। ডাট্‌সন্‌ এসে মাঝে মাঝে কাজ দেখে যাবে। আর নতুন একজন সায়েব—নামটা বোধহয় [illegible]—আসবে কোম্পানীর থেকে নতুন কুঠির কুঠিয়াল হয়ে।

চন্দ্রকান্ত তামাক টানতে টানতে শোনে।

—অবিশ্যি।—রতন মিষ্টি হেসে বলে,—আপনার সাহায্য সবসময়ই পাব কুঠির কাজ করবার সময়। নয় কি?

চন্দ্রকান্ত তামাক টানে—গম্ভীর স্বরেই বলে,—তা পাবেন। আপনিও কি কুঠির কাজে থাকবেন না আপনার বাবা আসবেন?

—বোধহয় আমিই থাকব। বাবা অন্যান্য জায়গার তাঁতিদের সঙ্গে চুক্তি করে ঠিকেদারীই করবেন। এ কুঠি হচ্ছে শুধু এই এলাকার জন্যেই।

চন্দ্রকান্ত আর কথা বলে না। বলবার আর কি ই বা আছে। ইংরাজ বণিকের বিষবৃক্ষ রোপনে সাহায্য করতে হবে। তাতে জলসিঞ্চণ করতে হবে চন্দ্রকান্তকেই। না করে কি আর উপায় আছে। এই বিষবৃক্ষে শাখা-প্রশাখা যে কতদূর বিস্তৃত হবে, এ বিষফলে যে দেশের নাড়ীর রক্ত কতটা বিষিয়ে যাবে—ভবিষ্যতই জানে।

চন্দ্রকান্ত আর ভাবতে চায় না।

পাকা কথা দিয়ে চলে যায় রতনমণিকে। রতনমণি তার কাজে সফল হয়ে আনন্দে ফিরে যায় বাবার কাছে। আবার আসবে এক সপ্তাহ পরে টাকা নিয়ে।

রতনমণি চলে যাবার পরই পণ্ডিত সুরু করে বলতে যাকে সামনে পায় তাকে,—এইবার শালাদের জব্দ করবার কল আসছে। এ্যাদ্দিন আমার ওপর বড় হম্বি-তম্বি চলত! এইবার খাবে শালারা কুঠিয়ালের চাবুক। সিধে হয়ে সুড় সুড় করে কাপড় দিয়ে যাবে কাঁধে করে বয়ে কুঠিতে। বাঘা সায়েব আসছে বাবা! ব্যাটাচ্ছেলের নাকি আবার সিংহের মত দুটো কুকুর আছে। এক একশালা জোলাকে শেষ করে দেবে।

কথাগুলো কানে যায় একরামপুরের সকলের। তাঁতের সুত্রজালের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। যে তাঁত ভাত কাপড় দিয়ে এসেছে এতদিন, সেই তাঁতই হোল তাদের কাল। তবু বেঁধে মারলেও শেষ পর্যন্ত যুঝে যাবে তারা। যুঝতেই হবে। গুপীনাথের বাড়ীতেই আবার ওরা জমায়েৎ হয়। কত কথা কত লোক বলে, কুঠির সায়েব নাকি মেরে পুঁতে ফেলে। কেউ বলে,—একটা ইঁদারা হবে কুঠিতে। সেখানে হাত পা বেঁধে ফেলে দেবে। কেউ বা বলে,—ঘরের বউদের সেপাই দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। জাত মারবে। বউঝিরা ভয়ে কাঁপে।

তবু গুপীনাথ, বলে, ভয় নাই। সবাই মিলে জবাই হবো না। সায়েবকে বলব, শ'য়ে পঞ্চাশজন আমরা চুক্তি করে কাপড় দোব, আর পঞ্চাশ জন দোব না। সব কাপড় নেয়া চলবে না। জমীদার বাবুকে এতদিন কিছু বলতে পারতুম না। হাজার হোক গাঁয়ের রাজা। কিন্তু কুঠির সঙ্গে বোঝাপড়া কোরব। সে আমাদের কে? তাকে কে মানবে?

সব তাঁতিই বলে,—কেউ না।

গুপীনাথ উত্তেজিত হয়ে বলে,—সব তাঁত আমরা কুঠিতে বাঁধা দোব না। কুঠির কাছে সব মাকু আমরা বিকোব না। তাঁতের ইজ্জতের জন্মে রক্ত দিতে পারি দরকার হলে। পারি না রক্ত দিতে।

সবাই বলে,—পারি।

—তবে এই কথাই ঠিক রইল। যে যে কুঠির সঙ্গে চুক্তি করবে। তারা আমায় বলে করবে। যারা চুক্তি করবে না। তাদের বাঁচাবার জন্য রইল আমার লাঠি।

—করবো না।—প্রায় সবাই বলে।

সবাই যে যার ঘরে চলে যায়। একরকম বোধহয় ভালই হোল। এতদিন জমীদার রাজাবাবু চন্দ্রকান্তের হুকুমে সব কাপড় দিতে হোত ঠিকে দামে পণ্ডিতকে। না দিলে জমীদার বাবু শাসাতেন। তাঁতিরা চোরাই মাল বেচা ছাড়া জমীদারের মুখের ওপর কিছু বলতে পারত না। এখন ত' ভালই হোল। জমীদার বাবুত' ত' আর কিছু বলবে না। কুঠির সঙ্গে তারা এক হাত দেখে নেবে।

মারের ভয় আছে, অত্যাচারের ভয় আছে, তবু আছে তাঁত আর লাঠি। দরকার হলে জমীদারের হুকুম পেলে একদিনে তারা কুঠি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। বোধহয় ভালই হোল।

ভালই হোল!—বলতে বলতে প্রহ্লাদ তার পাকা লাঠিটাতে অনেকদিন পরে তেল মাখায়। মাথা সমান বাঁশের লাঠিটা তেলে পেকে হলদে হয়ে গেছে। দু'বার ঘুরিয়ে দেখে নেয় প্রহ্লাদ। কিন্তু ঘোরাবার মুখেই—ও মাগো—একি গো!—শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নীরু তার ঠিক পিছনেই।

লাঠি ঘোরান বন্ধ করে বলে—লাগল নাকিরে?

নীরু বাসন হাতে যাচ্ছিল প্রহ্লাদের মায়ের কাছে, বুড়ী বলেছিলো, একটু তরকারী দোব। প্রহ্লাদের মায়ের হাতের রান্না নীরুর ভাল লাগে সেটাই যে শুধু কারণ তা' নয়।—ওর মা দেখেছিলো গতকাল নীরুর ঘরে গিয়ে যে শুধু ভাতই খাচ্ছে নীরু। শুধিয়েছিলো একটুকুন তরকারী করে নিলে ত' পারতিস? নীরু বলেছিল, আবার কে অত হাঙ্গাম করতে যায়। ভাইটিকে দুটো বেগুন সেদ্ধ দিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। আমার এতেই চলবে।

কারণ হতে পারে হয়ত হাতে পয়সা নেই। কিন্তু নীরু বলেনি সে কথা। বুড়ী ওকে বলে এসেছিল,—আসিস্ কাল একটু ভাল তরকারী রাঁধব।

নীরু বলেছিলো,—কেন, আমি কি রাঁধতে জানিনা?

তা' নয়—বলেছিলো প্রহ্লাদের মা—তোকে খাওয়াতে মন চাইলো তাই বললাম।

যাবো না।—বলেও আজ এসেছে নীরু! বুড়ী আমার যদি মনে কষ্ট পায়। ওকে যে বুড়ী ভালবাসে একথা ত' জানতে বাকী নেই তার।

এসেই দেখে লাঠি।

—কি মতলব বলোত' ?—বাসনখানা ভাল করে ধরে মাটিতে জোরে পা ফেলে দাঁড়িয়ে শুধোয় নীরু। প্রহ্লাদ বলে,—কি আবার মতলব ?

কি আবার বললে ত' শুনছি না। লাঠি বের করেছ কেন ? কোথায় দাঙ্গায় যাচ্ছ শুনি একবার ?

প্রহ্লাদ হাসে,—দুর দাঙ্গা করতে যাবো কেন ?

তবে কি ?

ওই মোড়ল বললে, তাই ইয়ে—সেত' এখন অনেক দেরী। কুঠি আগে হোক !

মারামারির গন্ধ পেলে হয়। মোড়ল বলল, আর তুমি নেচে উঠলে! কোনদিন যে অপঘাতে মরবে! কুঠি হলেই কি তুমি লাঠি নিয়ে তাদের কিছু করতে পারবে ?

বেশ, বেশ, সে যা হয় হবেখ'ন।

দাও, লাঠি আমার কাছে দাও।

খেপেছিস নাকি! ধর না, কুঠিয়াল যদি তোকে ধরে নিয়ে যায়! তখন লাঠি লাগবে না ?

না, লাগবে না। আমাকে ধরলে আমার হাত দা'খানা কাজে লাগবে। তোমাকে আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

পারবি তুই ?

তুমি কি আমাকে মনে করো, মরব আর চুপ করে থাকব ?

তুই ভীতু ছাড়া আবার কি ?

আমার সাহস দেখোনি ?

না দেখিনি। তোর সাহস থাকলে আর আমার এত দুর্ভোগ হোত না।

প্রহ্লাদের মুখে হাসিটা মিলিয়ে যায়।

তোমাকে দুর্ভোগ ভুগতে বলছে কে? যাও না যেখানে খুসী! তোমাদের সঙ্গে আর কথা কইব না হোল ত'? চল্লুম।

বাসন নিয়েই ফিরে যেতে চায় নীরু।

রাগ কচ্ছিস কেন? তুই ভেবে দেখ। সব কাজেই তোর ভয়ের জন্য আমায় পিছিয়ে যেতে হয়। বল, ভেবে বল।

বেশ ত' আর কোন কথা বলব না। যা খুসী করো।

নীরু চলে যায়।

প্রহ্লাদ লাঠিটা নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে আসে।

১১

আবার এলো রতনমণি।

দিন সাতেকের ভেতরই আরও একবার। এবার টাকা আছে সঙ্গে। এসে বরাবর জমীদারের ওখানেই উঠেছে রতন। টাকা সঙ্গে আছে। পণ্ডিতের ওখানে না যাওয়াই ভাল। তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। এ সময়ে চন্দ্রকান্ত রাত্রির সাজসজ্জায় থাকে। কেউ গেলেই এ সময়ে দেখা হওয়া তার সঙ্গে সম্ভব নয়।

রতনমণি গেল। নায়েবকে ডেকে পাঠাল রতনমণি। অনন্ত ঘোষাল কাছারীতে ছিল না। লোক পাঠাল তার কাছে। অনন্ত ঘোষাল একটু পরেই এসে উপস্থিত।

খুব মিষ্টি হেসে দাঁড়িয়ে থেকেই বললে,—এমন অবেলায়—।

—বিশেষ জরুরী কাজ আছে। একবার চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অনন্ত ঘোষাল নায়েবী করে চুল পাকিয়েছে। সে জানে কাকে কি কথা বলতে

হয়। কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হয়। তবু খুব মোলায়েম করেই বলে,—এখন ত' বাবু ব্যস্ত থাকেন। আচ্ছা আপনি কাপড়-জামা ছাড়ুন। জলযোগ করুন তারপর না হয়—।

রতনমণি একটু বিরক্ত হয়।—বিশেষ প্রয়োজন। এখুনী তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

—কিন্তু এখন —। মাথা চুলকোয় অনন্ত ঘোষাল।

—তা'হলে দেখা হবে না।—রতন গম্ভীর স্বরে বলে।

—আজ্ঞে এ সময় যে ডাকতে যাওয়া বারণ—। সন্ধ্যে হয়ে এলো।

—কোথায় আছেন তিনি?—শুধোয় রতন।

—জলসা ঘরে।

—চলুন আপনার সঙ্গে জলসা ঘরেই যাব।—রতন এগোয়।

সর্বনাশ! নায়েব দু'একবার ইতস্তত করে। তবু রতনের আদেশও অমান্য করা যায় না। এ বোধ তার এই কদিনে হয়েছে। তাই ভয়ে ভয়ে এগোয়। চন্দ্রকান্ত যদি রাগেন। তাহলে নায়েবকে আজ গালাপালি শুনতে হবে। আরও কি যে হবে কে জানে।

—আজ্ঞে এ সময়ে বাবুর মেজাজটা—।

—আরে রাখুন মশাই মেজাজ। মেজাজ আমারও ভাল নেই, চলুন।—

রতনের কথার দৃঢ়তায় অবাক হয়ে যায় অনন্ত ঘোষাল! ওর চুল পাকা বয়েসের ভেতর জমীদার চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে এভাবে কথা বলবার সাহস আর কারো সে দেখেনি। বাবু যদি রাগেন, তবে লোকটা আজ মারা পড়বে। সে আজ রাগাবে বাবুকে! রতনের আগে আগে চলে অনন্ত ঘোষাল।

কিছুদূর যেতেই তবলা বাঁধবার আওয়াজ কানে আসে। আর কানে আসে সারেঙ্গীর মৃদু ধ্বনি।

—একটু দাঁড়ান।—বলে জলসা ঘরের দিকে যায় নায়েব।

আজ রতনকে শিক্ষা দেবে নায়েব যে চন্দনডাঙার জমীদারের মেজাজ আর রতনের মেজাজ আকাশ পাতাল প্রভেদ। রতন দাঁড়িয়ে থাকে।

নায়েব অনন্ত ঘোষাল জলসা ঘরের দোরে সামনে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে বাবুকে ডাকে। চন্দ্রকান্ত তখন আতরের গন্ধে মশগুল হয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে সবে রাত্রির মৌতাতের মেজাজটা আনবার চেষ্টা করছিলো। অসময়ে নায়েবকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

রাজপুতানার আমদানী সেই বাঈজীটি সুরমায় আঁকা চোখ তুলে একবার তাকালো। তার পায়ে ঘুঙুর পরাছিল ভেড়ুয়া। তবলচী তবলা ঠোকা বন্ধ করে তাকালো।

রসভঙ্গ করলো অনন্ত ঘোষাল।

ইসারায় ডাকলো তাকে চন্দ্রকান্ত। নায়েব সসঙ্কোচে গিয়ে বলল সব। বলতে ছাড়লো না যে সে বারণ করা সত্বেও রতনমণি তরফদার এসেছে, বলেছে জমীদারের মেজাজ খারাপ হলে কিছু আসে যায় না। তারও নাকি মেজাজ আছে।

চন্দ্রকান্তর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল কিছুক্ষণের জন্যে।

প্রায় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল অনন্ত ঘোষাল। মুখ লাল হয়েছে। কাজ হয়েছে তাহলে। চন্দ্রকান্ত আলবোলার নল তুলে ঠোঁটে চাপলেন।

—তোমরা একটু এ ঘর থেকে যাও।—আদেশ করলো চন্দ্রকান্ত।

তবলচী উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল সারেঙীবাদক। দাঁড়ালো তানপুরাধারী। উঠল বাঈজী পানখাওয়া রাঙা ঠোঁট উলটে।

ঝম্—ঝম্—শব্দ করে নুপুরের আওয়াজ তুলে চলে গেল বাঈ চলে গেল ওরা।

—ডেকে দাও ওকে।—বললো চন্দ্রকান্ত এবার অনন্ত ঘোষালকে।

অনন্ত বাইরে গিয়ে অপেক্ষামান রতনকে ইসারায় করে যেতে বললে, অনেকটা তাচ্ছিল্য করে। নিজে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। জানে যে একটু পরেই হয়ত তলব পড়বে তার। দুটো পাইক নিয়ে রতনকে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে আটক ঘরে।

দাঁড়িয়ে রইল অনন্ত ঘোষাল।

রতনমণি ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

নমস্কার করলো চন্দ্রকান্ত হেসে, রতনমণিও প্রতিনমস্কার করে তখন।

—কবে এলেন ?

—আজই একটু আগে। এসেই আপনার এখানে উঠেছি।—বলে রতন।

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাব দেখিয়ে বলে,—তবে ত' আহারাদি কিছুই হয়নি। এখানেই তাহলে দয়া করে আহারাদি করবেন। সব বন্দোবস্ত করে দিতে বলছি।

রতন হেসে বলে,—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি কিন্তু আর একজনের বাড়ী থাকব বলে কথা দিয়েছি। কাজের কথা আছে আপনার সঙ্গে তাই চলে এলুম।

জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকায় চন্দ্রকান্ত।

টাকাগুলো বার করে রতন।

চন্দ্রকান্তর চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে ওঠে, টাকা দেখে। তবু নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করেই আলবোলায় মুখ দিয়ে বসে থাকে।

টাকাগুলো গুনে বলে রতন,—এই নিন একহাজার। কুঠির বাবদ কোম্পানীর টাকা আর দেড় হাজার আগাম বগুড়ার জমির বাবদ। দুটো রসিদ যদি দেন। আর সব লেখাপড়ার কাজ কাল হবে।

চন্দ্রকান্ত টাকার দিকে না তাকিয়েই বলে,—কুঠির কাজ কবে থেকে সুরু হবে ?

—খুব শীগ্রই। হয়ত বা এমাস থেকেই। খুব বড় কুঠি হবে বলে কথা হয়েছে।

—কারণ ? এখানে এত বড় কুঠি করবার উদ্দেশ্য কি জানেন ?

—কিছু কিছু জানি।—বলে রতন মুখ টিপে হাসে,—বিশেষ করে দুটো জেলার কাজ এই কুঠি থেকেই হবে। তার ভেতর নদীয়া জেলাটি পুরো আছে। শুধু কি কাপড় কেনা ?

—আরও আছে ?—ভ্রূ তোলে চন্দ্রকান্ত।

—আরও আছে। মাস ছয়েকের ভেতর কোম্পানীর কাপড় চালান আসবে বিলেত থেকে। সেখানে ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাঙ্কসায়েরের মিল থেকে। নমুনা দেখেছি আমি।

—আমদানী করলেই যে তাদের কাপড় চলবে কি করে বুঝলেন? আমার জোলায়া ত' নিশ্চয়ই তার চেয়ে সস্তায় কাপড় দেবে,—এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি।

রতনমণি মৃদু হাসে,—চট্ করে হলপ্ করে বলবেন না চন্দ্রকান্তবাবু। সে কাপড় আমি দেখেছি। নমুনা দেখে অবাক হয়ে গেছি। ফিন্‌ফিনে পাতলা গরদের মত—যাকে ওরা সিল্ক বলে।—দু'টাকা আড়াই টাকায় দেবে। কে কিনবে আপনার মলমল, আর মসলীন?

—হতেই পারে না।—উঠে বসে চন্দ্রকান্ত।

—স্বচক্ষে দেখা। সাধারণ কাপড় থান প্রতি তিন-চার টাকা কমে পাবেন। তাছাড়া সে কাপড়ের বুনুনী দেখতে তাঁতের চেয়ে অনেক ঠাসা। রুটির মত জমীন্।

—আমার জোলার চেয়ে ভাল বুনতে পারে কাপড়—দেখলেও যে বিশ্বাস করতে পারিনা। দিল্লীর দরবারে আমার জোলাদের মলমল মসলীন নিয়ে যেত আদর করে। নবাব সিরাজের পত্র আছে আমার তোষাখানায়। মুর্শিদাবাদের গরদ ফেলে তিনি পরতেন আমার জোলাদের হাতে কেনা তাজকন্ধা পাড়ের চক্‌মিলান চাদর। বলেন কি রতনবাবু? বিলেতের তাঁতি এত ভাল বোনে!

রতন ম্লান হাসে,—আপনি ভুল করছেন, আমিও ভুল করেছিলাম। তাঁতি বোনে না, কল বোনে। কলেতে বোনা হয় সব কাপড়। লোক কম লাগে, খাটতে হয় কম, দাম সস্তা দিলে ওদের গায়ে বাধে না।

—কলে বোনে?—

হ্যাঁ। ডাট্‌সন্ সায়েবের কাছ থেকে বই নিয়ে আসব আমি। দেখবেন।

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর হয়েই বসে থাকে। লোহার কঠিন মেসিনে মানুষের হাতের চেয়েও মোলায়েম জমীন্ বোনা যায়। এ কেমন আজগুবী কথা। মানুষের হাতের চেয়েও বড় শিল্পী হোল লোহার মেসিন? সে মেসিন কেমন? দেখতেই বা কেমন?

একজন জোলা যদি ছখানা সাড়ী বোনে দিনে। কলে বোনা হবে হু'গণ্ডা বলতে থাকে রতন,—কি করে আপনি এদের চেয়ে সস্তা দেবেন?

চন্দ্রকান্ত বিহ্বল হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। কিইবা বলবে।

রতন বলে,—কথাটা কাউকে না বলাই ভাল। চালান এলেই দেখতে পাবেন। এই কুঠি থেকেই মাল যাবে ছটো জেলার বাজারে। শুধু কি তাই আপনাদের কাপড় আবার সস্তায় কিনে নিয়ে চালান দিয়ে বেচবে বিলেতের সব দেশে অনেক বেশী দামে।

চন্দ্রকান্তর রাঙা মুখখানা সাদা হয়ে গেছে যেন। সব গেল এবার। প্রাসাদের চূড়া সমেত হয়ত বা ধ্বসে পড়বার সময় কাছিয়ে এসেছে। তবু কতদূর থেকে জাহাজে কারা কোথাকার মানুষ এসে তার বহুকালে পালিত প্রজাদের মুখের ভাত কেড়ে নেবে. একথা ভাবতেও যে চন্দ্রকান্তের মাথায় আগুন ধরে যায়। চন্দ্রকান্ত কিছুটা বা ভয়ে কিছুটা ক্রোধে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সামনের বোতল থেকে হুইস্কি ঢালে খানিকটা গ্লাসে।

দুর্বল স্নায়ুকে সতেজ করবার জন্যে। রতনমনিও চুপ করে বসে থাকে, দেখে জমীদার চন্দ্রকান্তর ভাবান্তর।

তাহলে যে এরা সবাই মরে যাবে রতনবাবু?—

রতনও যেন অন্যমনস্ক, বলে,—এরা ত' মরবেই।আমি অনেক আগেই জানি। কোম্পানীর কাছাকাছি থেকে ওদের যা কিছু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে যা তাই সত্যি করে আপনাকে বললাম। পয়সাই ওরা চায় মানুষ চায় না। আমাদের হয়ত বা মানুষ বলে ভাবেই না।

চন্দ্রকান্ত সতেজ হয়েছে কোহলের প্রতিক্রিয়ায়, গরম হয়ে বলে শুধু,—ভাবাতে হয় রতনবাবু, নিজেরা মানুষ না হলে মানুষ বলে ভাববে কি করে। কিন্তু ওরা ভুল করেছে, চন্দনডাঙায় মানুষ আছে, অন্তত একজন আছে, সেটা ওরা টের পাবে। বেশ আপনি কুঠির কাজ সুরু করুন। আসতে দিন ওদের। চেহারা-গুলোও দেখি, অন্তত!

অনন্ত ঘোষালকে ডাকে চন্দ্রকান্ত।

অনন্ত ঘোষাল বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বিরক্ত হচ্ছিল। কি ব্যাপার! রতন লোকটাকে এখনও আটকঘরে রাখবার হুকুম এল না! জমীদারের ডাক শুনতেই ও বরকন্দাজ দুজনকে ডেকে দরজার কাছে রেখে নিজে ঘরে ঢুকল। বরকন্দাজদের দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে ত' লোকটাকে!

কিন্তু ভেতরে ঢুকে অবাক।

রতনমনি জমীদারবাবু পাশ ঘেঁসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। দুজনের মুখই অবশ্য খুব গম্ভীর। চন্দ্রকান্ত টাকাগুলোর দিকে দেখিয়ে বলে,—

—টাকাগুলো নিয়ে যাও। এঁর নামে দেড় হাজারের একটি রসিদ আর কোম্পানীর নামে এক হাজারের একটি রসিদ করে নিয়ে এসো। সই করে দিচ্ছি।

অনন্ত চলে যেতে চায়। ডাকে আবার চন্দ্রকান্ত,—শোন!—এবার গলাটা ক্রোধান্বিত।—অনন্ত ভয় পেয়ে ফিরে দাঁড়ায়—শোন রতনবাবু গাড়ী থেকে নেমেই এখানে এসেছেন জানতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে এঁর খাবার থাকবার ব্যবস্থা করোনি কেন? মাথায় কি গোবর পোরা!—চেঁচিয়ে ধমকে ওঠে চন্দ্রকান্ত।

হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে অনন্ত ঘোষাল। উল্টো বিপদ। রতনবাবু মিটি মিটি হাসছে। জমীদারকে বলে রতন,—না, না, উনি বলেছিলেন আমিই রাজী হইনি।

—যাও।—বলে চন্দ্রকান্ত আলবোলা টানতে থাকে।

চন্দ্রকান্তর মাথায় তখন ঘুরছে কুঠি—ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মানুষ মারা কল—আর তার তাঁতি প্রজাদের বুভুক্ষু আর্তনাদ!

রতনই কথা বলে প্রথম,—আগামী হপ্তায় এসে কিছু মজুর ঠিক করে যাব। আপনি যদি একটু নায়েব মশাইকে বলে দেন আমাকে লোক জোগাড়ে সাহায্য করতে—!

বলে দোব।

আপনি না বললে ত' কেউ কাজ করতে চাইবে না—রতন বলে চন্দ্রকান্তকে একটু খুসী করবার জন্যে। চন্দ্রকান্ত কিন্তু কড়া জবাবই দেয়—না, তা কেউ করবে না।

রতন আর কথা বলে না।

চন্দ্রকান্ত শুধোয়—গানবাজনা ভালবাসেন ?

নিশ্চয়ই ! আপনি ভালবাসেন নাকি ?

চন্দ্রকান্ত হাসে—রোজই ত' জলসা বসে এই ঘরে। বেশ আজ রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ রইল এই ঘরে ভর রাত নাচগান হবে, আসবেন।

তবে আমিও একটু অনুরোধ করব—বলে রতন,—আজ আবার বাঁশী শোনার নিমন্ত্রণ রইল আপনার।

আপনি বাঁশী বাজাতে পারেন নাকি ? বাঃ !

কিছু—কিছু।—বলে রতন।

অনন্ত ঘোষাল রসিদ দুটো নিজে হাতে দেয় রতনের হাতে।

রতন আর দেরী করে না। উঠে পড়ে।

—নমস্কার।

—নমস্কার। রাত্রে আসছেন ত' ?

—নিশ্চয়ই।

বেরিয়ে আসে রতন। পিছু পিছু আসে অনন্ত ঘোষাল। দশটা টাকা অনন্ত ঘোষালের হাতে গুঁজে দেয় রতন।

বলে একটু হেসে,—অনেক কষ্ট করলেন আমার জন্যে।

নায়েবের মুখখানা লজ্জায় অপমানে রক্তাভ হয়ে ওঠে—না, না, এ আর কি ? টাকাটা কিন্তু—।

নায়েব তার কথা শেষ করবার আগেই রতন হন্ হন্ করে চলে যায়।

রাস্তায় চলতে চলতে এতক্ষণে তার মনে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ীর কথা। আর চন্দ্রার মধুর ব্যবহারের কথা। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে তখন। মাটীর বড় সড়কটা উজ্জ্বল সাদা হয়ে উঠেছে চাঁদের আলোয়। অসংখ্য বিন্দু বিন্দু নক্ষত্রের

ভীড়ে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে আকাশের নীল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর চামচিকের আওয়াজ মাঝে মাঝে বড় বড় পলাশগাছ অথবা অশ্বত্থগাছ থেকে শোনা যায়। নিস্তব্ধ গ্রাম। সড়কে একা একা চলছে রতন। দুএকজন কথনও কখনও ওর পাশ কাটিয়ে যায় মিট্‌মিটে লণ্ঠন হাতে দোলাতে দোলাতে। জোনাকীর আলো ম্লান দেখায় চাঁদের উজ্জ্বলতার ভেতরে। তবু কচু বনে অথবা বেত ঝোপের আধা অন্ধকারে জোনাকীর চকমকি দেখতে ভারী ভাল লাগে। এত ফাঁকায় যেন ভাল করে নিশ্বাস নিতে পারে না রতন। গুন্ গুন্ করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই পথ চলে।

পণ্ডিতের বাড়ীর দরজার সামনে এসে একটু দাঁড়ায়। কোন সাড়া শব্দই নেই। কি ব্যাপার! সব ঘুমিয়ে পড়ল না ত' ?

হাঁকে,—পণ্ডিতমশাই—ও পণ্ডিতমশাই !

দু' চারবার হাঁক দিতেই বেরিয়ে আসে চন্দ্রা। উঁকি দিয়ে ওকে দেখে সদরের সামনেঁ, এসে আস্তে বলে,—ভেতরে আসুন।

অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম বৌদি !—হেসে বলে রতন।

তেমনি আস্তেই চন্দ্রা বলে,—না, বিরক্ত কিছু নয়। আপনি বসুন ঘরে। আমি আসছি। রতনমনি ছোট বাক্সটা নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বসে।

একটু সময়ের ভেতরেই চন্দ্রা গামছা, হাত মুখ ধোবার জল, আলো নিয়ে আসে,—নিন্। হাত মুখ ধুয়ে নিন।

দাঁড়ান একটু জিরোই।—হাঁফ ছাড়ে রতন। এতটা হেঁটে পরিশ্রম হয়েছে ওর। শুধোয়,—পণ্ডিতমশাই কোথায় ?

বাইরে।

এত রাতেও বাইরে। একা একা আপনার ভয় করে না ?

মৃদু হেসে চন্দ্রা ওর তাকিয়ে বলে,—অভ্যেস হয়ে গেছে। কত সময় ত' রাত্তিরেও থাকেন না। একা একাই ত' থাকি।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে চন্দ্রা—একটু বা বিষাদের নিশ্বাস বলেই মনে হয় রতনের। তবু চোখ বড় বড় করে বলে,—বলেন কি ? সমস্ত রাত কোথায় থাকে ?

হয়ত যাত্রা-টাত্রা শুনতে গেল।

আপনি সঙ্গে যান না কেন?

ভাল লাগে না।—তেমনি বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর চন্দ্রার।

ওর কণ্ঠের বিষণ্ণতায় একটুও বিস্মিত হয় না রতন। এমন একটা ধারণাই করেছিল একদিন। ও জানে চন্দ্রার মনে কোথাও একটা গভীর ফাঁক রয়ে গেছে, সেটা পূর্ণ করবার আকাংখা ওর সর্বদা। একটু সময় চুপ করে থেকে রতন বলে, কই দিন, জল দিন।

জল নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বসে।

চন্দ্রা ততক্ষণে নিজের ঘর থেকে মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসেছে।

জল খেয়ে জামাটা খুলে বসে রতন।

চন্দ্রা দাঁড়িয়ে থাকে।

রতন গুন্‌গুন্ করতে করতে হঠাৎ নজর করে যে চন্দ্রা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। শুধোয়, আচ্ছা বৌদি বলতে পারেন কানাই নামে কোন জোলা আপনাদের এদিকে থাকে কিনা? চন্দ্রা তক্ষুণি কোন উত্তর দিতে পারে না। এর আগের বারেও ত' কানাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে রতনকে।

কেন বলুন ত'?—শুধোয় চন্দ্রা।

না, শুনলাম।—মনে মনে বানিয়ে নিয়ে বলে রতন,—শুনলাম, লোকটা নাকি খুব ভাল বাঁশী তৈরী করতে পারে। তাই।

চন্দ্রা অবাক। কানাই আবার কবে বাঁশী তৈরী করতে শিখল! বলে,—সেত থাকে একরামপুরে।

অ! একরামপুরে!

রতন আর ও সম্পর্কে কোন কথা না তুলে বলে,—একটু শিগ্‌গির যদি আজ ভাত দিতে পারতেন! পণ্ডিত মশাই ত' এখনও এলেন না?

শিগ্‌গিরই দোব। দেরী হবে না—বলেও দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রা।

অনেক সংকোচ কাটিয়ে বলে ও,—আজ বাঁশী বাজাবেন না?

না,—বলে—রতন,—আজ আবার জমীদার মশাই বাঁশী শুনতে চেয়েছেন। সেখানে আমার নাচ গান শোনবার নিমন্ত্রণ।

নাক কুঁচকে ওঠে চন্দ্রা,—না, না ওখানে যাবেন না।

কেন?

না, ওরা মানুষ ভাল নয়। মদ খায়। আরও কত কি—।

হেসে ফেলে রতন,—তা' খেলেই বা। আমায় ত' আর নাক টিপে খাইয়ে দিতে পারবে না। তাছাড়া যদি খাই-ই তা আপনি অমন করে বারণ করছেন কেন?

চন্দ্রার কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে,—মুখটা নীচু করে বলে,—যাই আপনার রান্নার জোগার করিগে।

বলে বেরিয়ে যায় চন্দ্রা।

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে রতন বাক্স খুলে বাঁশীটি বার করে। বসে ফুঁ দেয়। অতি সস্তা একটি গজল সুর বাঁশীতে মধুময় হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিত ফেরে বাড়ীতে। ফিরে চন্দ্রার কাছে সব শোনে, এমন কি জমীদার বাড়ী নিমন্ত্রণের কথা পর্যন্ত। বলে চন্দ্রাকে,—কত বড ভাগ্যি ছোঁড়ার। রাজাবাবু ওর বাঁশী শুনতে চেয়েছেন?

চন্দ্রা ভ্রূ কুঁচকে বলে,—আমিত' যেতে বারণ করেছিলাম।

কেন?

জমীদার বলে কি তার সব কথা শুনতে হবে।

আরে! পণ্ডিত আকাশ থেকে পড়ে,—সব কথা মানে! খাস জলসাঘরে নেমন্তন্ন, রাজরাজার ভাগ্যেও জোটে না—আর মানে বারণ করে দিলে! কি হোচ্ছ দিন দিন।

চন্দ্রা বলে—খাস জলসাঘরে নেমন্তন্ন; তবে আর কি! মদ গিলে আসতে হবে!

পণ্ডিত বটে—আলবৎ খাবে। ওর বাপ মদ খাবে! চোদ্দ পুরুষ মদ খাবে! রাজরাজার ব্যাপার তুই চুনো পুঁটী কি বুঝবি?

চন্দ্রা আর কথা বলে না। জানে কথা বলে কোন লাভ নেই। লোচন

পণ্ডিতের মনের যে আঁধার সেখানে আলো নিতে গেলে আলোই নিভে যায়। অন্ধকার ঠিকই থাকে। থাক্। দীর্ঘশ্বাস একটা চেপে যায় চন্দ্রা।

পণ্ডিত নাচতে নাচতে আসে রতনমনির কাছে,—ভারী সুখবর শুনলুম।

কি পণ্ডিত মশাই? ছিলেন কোথায়?

এ্যাই তাঁতি পাড়ায়। আপনাদেরই কাজে।—সটান মিথ্যে বলে পণ্ডিত,—কিন্তু সুখবরটি কি ঠিক?

কি?

বাবুদের বাড়ী আপনার জলসাঘরে নেমন্তন্ন?

হ্যাঁ।—উদাস কণ্ঠেই বলে রতন,—কিন্তু যাবো না।

বলেন কি রাজরাজড়ার নেমন্তন্ন যাবেন না! জানেন জলসাঘরে নেমন্তন্ন আর তার হয় না। প্রায় হয় না বললেই চলে!

জানবার দরকার নেই। আমি যাবো না পণ্ডিত মশাই।

মুখটা শুকিয়ে যায় পণ্ডিতের। বলে,—প্রথমে কি বাবুদের বাড়ীই উঠেছিলেন?

হ্যাঁ।—কথা আর কিছু ভাঙে না রতন,—শুনুন,—পণ্ডিত চলে যেতে চায় দেখে রতন বলে,—কানাই তাঁতিকে কাল একবার ডেকে আনতে পারবেন?

কানাই তাঁতিকে! মাথা চুলকোয় পণ্ডিত। ওই শালার বাড়ীতে তাকে যেতে হবে! গিয়ে ডেকে আনতে হবে!

কেন কিন্তু কিন্তু করছেন পণ্ডিতমশাই।

কানাই লোকটা ভাল নয়। তাই বলছিলুম এসব লোকের কাছে সেধে ডাকতে যাওয়া! রতন তবু বলে,—তাহলে ডাকতে পারবেন না?

আচ্ছা কাউকে দিয়ে ডাকিয়ে দোব।

রতন জিদ্ করে,—আপনাকে নিজেই যেতে হবে। কাল সকালে।

আচ্ছা, দেখি।—মাথা চুলকোতে চুলকোতে পণ্ডিত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রান্নাঘরে যেতে চন্দ্রা বলে,—রতনকে খেতে ডাকো। ওবেলার ভাত গরম

করে নিইছি। আর একটু তরকারী ভাজা করে দিইচি। সঙ্গে একটু ক্ষীর দোব। শিগ্‌গির ডাকো ওর আবার যেতে হবে বাবুদের বাড়ী।

পণ্ডিত মুখ গম্ভীর করে বল্লে,—না, ও যাবে না বাবুদের বাড়ী।

বলেছে তোমাকে ?

হ্যাঁ। একেবারে চ্যাংড়া, খামখেয়ালী। অস্থি ই'য়ে—।—মনের ঝাল মেটাতে কসুর করলে না পণ্ডিত।

চন্দ্রার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—না যাওয়াই ভাল। তবে আর কি, আর দু-একটা ডালনা চচ্চড়ি করে তারপর ডাকা যাবে।

বলতে বলতে কানে আসে রতনের বাঁশীর আওয়াজ। আবার বাঁশী ধরেছে রতন।

চন্দ্রা আর কথা বলে না।

পণ্ডিত বাইরে কাউকে ডাকতে যায়, তাকে দিয়ে যদি কানাইকে ডেকে আনানো যায়। নিজের যেতে মোটেই ভাল না পণ্ডিতের। হয়ত টিট্‌কিরি দেবে। মুচকী হাসবে কানাই। তাছাড়া তার একটা সম্মানও ত' আছে। কিন্তু রতন যদি জানতে পারে সে নিজে যায়নি। তবে-ত' চাকরীটি যাবে। চাকরী গেলে সম্মানই বা থাকবে কি করে ?

পণ্ডিত অনেক ইতস্ততঃ করে শেষে নিজে যাওয়াই স্থির করে।

পরদিন সকালে যখন পণ্ডিত পৌছুলো কানাইয়ের বাড়ী, তখন থাকোমণির সঙ্গে কানাইয়ের প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম।

কেন তুই ওর ঘাড়ে পড়বি। ও কাঁদলেও তোর ঘুম ভাঙবে না।—বলছিল কানাই। মানে ঘুমন্ত নাসিকা গর্জনরতা থাকোমণি ঘুমের ঘোরে বাচ্চা ছেলেটার ঘাড়ের ওপর পড়েছিলো। কানাই ওর নাকডাকা এতদিন সহ্য করে এসেছে। কিন্তু আর কত সইবে! শেষকালে ছেলেটাকে মেরে ফেলবে!

জল ঢেলে দোব গায়ে। নাকের ভেতর ছারপোকা ছেড়ে দোব।—গর্জায় কানাই।

থাকোমণিও গলার পর্দাটা চড়িয়েই বলে,—ঘুমুলে আবার মানুষের জ্ঞান থাকে নাকি! ডাকো পাঁচজনকে বলুক ত'—ঘুমুলে কে দেখতে পায় যে কে চাপা পড়ল আর না পড়ল।

তা বলে কাঁদলে শুনবিনি ?—কাণও কি বন্ধ থাকে!

কি বুদ্ধি! বলিহারী! ঘুমের ভেতর কেউ শুনতে পায়!

পণ্ডিতের ডাক কানে আসে ইতিমধ্যে কানাইয়ের। চমকে ওঠে ও। লোচন পণ্ডিত তাব বাড়ীতে? সূর্য কি পশ্চিম দিকে উঠল!

কানাই আছো হে!

যাই।—কানাই বেরিয়ে আসে। পণ্ডিতই এসেছে।

পূর্বের বিবাদ থাকা সত্ত্বেও কানাই হেসে বলে,—আজ্ঞে আপনি কষ্ট করে এসেছেন কেন?

বড় জরুরী কাজ।—গম্ভীরভাবে বলবার চেষ্টা করে পণ্ডিত,—এখুনী একবার আসতে হবে আমার সঙ্গে। ছোট ঠিকেদার বাবু ডেকেছে।

যেন কিছু একটা শাস্তি কানাইকে পেতে হবে এমনি ধারা বলবার ধরণ পণ্ডিতের।

এখুনী চলো। জরুরী দরকার।

কানাইয়ের মুখ শুকিয়ে যায়—কেন ডেকেছে জানেন? ভয়ে ভয়ে বলে কানাই।

পণ্ডিত চোখদুটো দুবার বুঁজে যেন জেনেও বলে,—না। জানি না। নাও চট্‌পট্।

ভয়ে ভয়ে একটা চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে কানাই পণ্ডিতের সঙ্গে।

বাড়ী পৌঁছে রতনমণির কাছে কানাইকে এনে পণ্ডিত বলে,—এই যে ধরে এনেছি ব্যাটাকে।

রতনমণি পণ্ডিতের বলবার ধরনে একটু অবাক হয় বলে,—আচ্ছা আপনি এখন যান।

পণ্ডিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে যায়।

রতনমনি কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—তুমিই ত' একবার এসেছিলে আমার কাছে। বলেছিলে পণ্ডিত মশাই কাপড়-টাপড় সরান গাঁট থেকে।

আঁজ্ঞে হ্যাঁ।—ভয়ে ভয়ে বলে কানাই।

রতন বলে,—তোমাকে একটা কাজ দোব ভাবছি। করতে পারবে?

কি বলুন।

শুনেছ ত' একটি কুঠি হচ্ছে এখানে কোম্পানীর।

আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

সেই কুঠির গোমস্তার চাকরী যদি তোমায় দিই। পারবে করতে?

কানাই যেন হাতে স্বর্গ পায়। ও কোন কথা বলবার আগেই বলে রতন,—অবশ্য মাইনে ভালই পাবে। ধরো দশটাকা মাসে।

মাসে দশটাকা! এত পয়সা মাইনে! কানাইয়ের মাথা ভোঁ ভোঁ করে।

পারবে?

নিশ্চয়ই হুজুর। যদি গরীবকে দয়া করেন।—।

তবে শোন।—বলে রতন,—দিন পনোরোর ভেতরই আমি কাজ আরম্ভ কোরব। তোমাকে কুঠি তৈরীর কাজেও থাকতে হবে। যখন যা বলব, করবে।

ঘাড় নাড়ে কানাই হাত জোড় করে।

আচ্ছা এখন যাও। পরে খবর দোব।

কানাই আনত হয়ে প্রণাম করে প্রায় নাচতে নাচতে চলে যায়। কানাই চলে যেতেই পণ্ডিত ঘরে ঢোকে। ও আড়াল থেকে সব শুনেছে। তবু মিথ্যে করে বলে,—কেনোর কাছ থেকে শুনলুম ওকে কুঠির গোমস্তা রাখবেন। তাহলে আমার কি হবে ছোটবাবু?

আপনিও থাকবেন।—মৃদু হেসে বলে রতন।

পণ্ডিতের তবু কথাটা মনের মত হয় না,—দুজনে কি করে কাজ করবো—?

সে কথা আপনার ভাবতে হবে না পণ্ডিতমশাই। আপনি আপনার কাজ করবেন, সে তার কাজ করবে। দুজনেই আমি যা বলব তাই করবেন। তার সঙ্গে ত' আপনার কোন সম্পর্ক নেই। দিন পনেরো পরেই কাজ আরম্ভ করব আমি।

মুখ কালো করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পণ্ডিত। রতনমনি মনে মনে হাসে। ঝানু ঠিকেদার নীলমণি তরফদারের ছেলে সে—এ কথা ঠিকই।

সে ঠিকই জানে কাকে দিয়ে কি করাতে হয়। সে জানে যে পণ্ডিতের হাতে সে পড়বে না। কানাই তাকে রক্ষা করবে। কানাইয়ের হাতেও সে পড়বে না, পণ্ডিত তাকে রক্ষা করবে। সাপ আর নেউল দুটোকে নিয়ে খেলানই নিরাপদ। নিজেরাই ঝগড়া করবে তারা। কাজ তার হাঁসিল হয়ে যাবে ইতিমধ্যে। কানাইয়ের প্রথম দিনের কথায়ই টের পেয়েছিল রতন যে কানাই পণ্ডিতের শত্রুপক্ষের একজন, সেদিন থেকেই ভেবে রেখেছিল রতন যে লোকটাকে কাজে লাগাতে হবে। আজ কাজে লাগবার এমন সুযোগ ত' সে অবহেলা করতে পারে না, কুঠি তাকে করতেই হবে। দ্বন্দ্বের রস পেয়ে গেছে রতনমনি। ভারী আহ্লাদ লাগছে ওর এই সব কাজে। সেইদিনই বিকেলে চলে যায় রতনমনি সদরে।

১২

মাস খানেকের ভেতর কুঠির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। রতনমনি যেন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে কুঠির কাজে। তৈরী হোল পাকা কোঠা দু'খানা, দেড় ইঞ্চি মোটা রডের বেড়া দেয়া আটকঘর। হোল পেয়াদা, সিপাইদের থাকবার ঘর। অপিসের হল ঘর আর টিনের মস্ত বড় গুদাম ঘর। সবই পোক্ত মজবুত। প্রচুর পয়সা খরচ হোল, চুরী হোল। রতনমনি কিন্তু এক পয়সাও সরায় নি। ইচ্ছে করলে বহু টাকা সরাতে পারত, কিন্তু ওর বেশ ভাল লেগে গেছে কাজটি, তাই ওদিকে ওর মন নেই। মন ওর কিসে কাজটি ভাল হবে।

সরাল পণ্ডিত, কানাই আর মিস্ত্রিরি।

পণ্ডিত ইটের পাঁজায় গেল। ইট এল, কিন্তু সব এলো না। টাকা কিন্তু

সবাই নিলে পণ্ডিত। ধরলে ব্যাপারটা কানাই। সোজা এসে রতনের কাছে বলে,—ঠিক যা ধরিচি তাই!

কি?

আজ্ঞে টাকা সরিয়েছে। তাই ত' পাঁচ হাজারী ইটের গাদা দেখলে কানাই চিনবে না?

কে সরাল?—শুধোয় রতন।

ওই লোচন, আর কে? ইট আনতে বললেন পাঁচটা, আনলে তিনটে। তাছাড়া, শশীপদ কুমারদের ঠেঙেও ত' শুনিচি আমি।

রতন হাসে। কানাই যে একথা বলবে রতন জানত। হাসতে হাসতে বলে,—ঠিক আছে, আমি দেখবখন। তুমি নিজের কাজ করো।

কড়ি বসানর বেলায়, জানলা কপাটের বেলায় কানাই হয়ত বা ছুতোর মিস্ত্রির সঙ্গে শলা করে কিছু পয়সা ট্যাঁকে গুঁজল।

হন্ হন্ করতে করতে এলো পণ্ডিত,—ডোবাবে আপনাকে। একদম ডোবাবে।

কে পণ্ডিতমশাই?

ওই কেনো শালা!

রতন হেসে ফেলে এবারও,—ওর ভগ্নীর সঙ্গে আবার সম্বন্ধ পাতানো কেন? কি হয়েছে খুলে বলুন না?

তখনই বললুম ছোট বাবু শালাকে ঢোকাবেন না। আমি একাই চারদিক দেখে শুনে ঠিক করে নিতে পারব। তা' আপনি ত' তখন—। চাঁড়ালের কথা বাসী হলে মিষ্টি হয়।

রতন জিজ্ঞাসু নেত্রেই চুপ করে থাকে ওকে বক্ বক্ করবার সুযোগ দিয়ে।

পণ্ডিত বলে,—ব্যাটা পয়লা নম্বর চোর। অন্তত শতখানেক টাকা সরিয়েছে। জানলা দরজা থেকে।

রতন হেসেই বলে,—শ খানেক টাকায় ত' কাঠই কিনিনি পণ্ডিত মশাই।

তা হোক, পঞ্চাশ ত' বটে। ব্যাটাকে কুঠির আটক ঘরে পুরুন। ওকে দিয়েই নোতুন আটক ঘর বউনী হোক। পাঠাব প্যায়দা।

না, থাক। আমি দেখবখন। আপনি নিজের কাজে যান।

পণ্ডিত কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হয়ে রতনের মস্তিষ্ক গোময় পূর্ণ কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে।

গুপীনাথ এর ভেতর একদিন কুঠি দেখতে আসে।

আশ্চর্য এই যে রতন তাকে আদর করে নিয়ে ঘরে বসায়! এ সব প্যাঁচ ওর বাবার কাছ থেকে শেখা।

এ কুঠি ত' তোমাদের জন্যই।— বলে রতন!

দুটো খানসামাকে বলে,—ডাব দে' দুটো আর সন্দেশ।

গদাই ছিল সঙ্গে,—ও বলে রতনকে,—আমার বন্ধু আপনার এখানে আছে।

অর্থাৎ বন্ধু কানাই যেন একটা কেউ কেটা ব্যক্তি।

রতন শুধোয় বিনীত ভাবেই,—কে?

কানাই বসাক।

ও! হ্যাঁ, কানাই আছে। ডেকে দোব।

না।—গদাই বন্ধু গর্বে তৃপ্ত হয়। বলবামাত্র চিনেছে কানাইকে। আবার বলে ডেকে দোব!

গুপীনাথ ওর পাকা বাবরী চুলে হাত বোলাতে বোলাতে আস্তে বলে,—ডাব আর কাজ নেই।

না, না, তাকি হয়!—রতন নাছোড়বান্দা—এই এলো বলে!

গুপীনাথ দেখলে ঘুরে ঘুরে—সায়েব কুঠির পিছনে বিরাট ইন্দারাটা অবধি।

রতন শুনিয়ে রাখলে একটু,—তোমাকে ত' সব সময়েই আসতে হবে মোড়ল। আর মাসখানেকের ভেতরই সায়েব এসে পড়বে। তোমাকে ত' আগে ডাকবে।

একটা হাঁই তুলে বলে গুপীনাথ,—ডাকে ডাকবে!—

অর্থাৎ ডাকলে বিশেষ লাভ কিছু হবে না।

গুপীনাথ বলে,—আচ্ছা বাবু, আপনাকে একটা কথা শুধোই আপনাকে—

কাপড় বুনবো আমরা, খাটবো আমরা, জিনিষ আমাদের, তার ওপর অন্য মানুষের জোর খাটবে কেন ?

প্রশ্নটা বড় কঠিন। তবু রতন একটু হাসে,—দেখো এর জন্যে দোষ ঠিক কোম্পানীর নয়। দোষ তোমাদেরই, মানে তোমাদের রাজার। তারা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করে তাদের ব্যবসা করতে হুকুম দিয়েছে। হুকুম না দিলে ত' আর এমন হোত না !

হুকুম দিয়েছে বলেই কি তারা জোর জুলুম চালাবে ?

রতন কোম্পানীর তরফ থেকেই কথা বলে, ভবিষ্যতে তাই'ত তাকে বলতে হবে,—জুলুম ত' কোম্পানী করছে না। শুধু কাপড়গুলো তাদের কাছে বিক্রি করতে বলছে।

কিন্তু দর যে বড্ড কম করে দিচ্ছে।

চড়া দরে তোমাদের মাল নিলে কোম্পানীর কি লাভ বলো ?

কিন্তু আমাদের যে লোকসান।—এ লোকসান আমরা সইব না আপনাকে বলে রাখলুম। জোর কোম্পানীর থাকলে। আমাদেরও আছে।

রতন একটু ঘাবড়ে যায়,—গুপীনাথের কথা বলার ধরণে। ও আর কথা বাড়ায় না। গদাইয়ের দিকে তাকাতেই গদাই খুড়োর কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপ বাবুরী চুল দুবার নাড়া দিয়ে বেশ শক্ত হয়ে বসে। ইতিমধ্যে ডাব মিষ্টি নিয়ে আসে পেয়াদা।

গুপীনাথ গদাই জলযোগ করেই ওঠে। চলে যায় ওরা।

কুঠি দেখতে কত লোক আকে।

রাত্রে গ্যাসবাতি জ্বেলে কাজ হয়, দিনে দলে দলে মজুর খাটে। মজুর সব চন্দনডাঙার আশে পাশের খামারের চাষীরা। চাষ আবাদের কাজ শেষ করে উপরী কিছু পয়সার লোভে আসে। জমীদার চন্দ্রকান্ত নায়েবকে বলে দিয়েছে মজুর পেতে যেন কোনরকম অসুবিধে না হয় রতনমনির।

মাঝে মাঝে চন্দ্রকান্তর কাছে যায় রতন।

বাঁশী বাজায়। ওর বাঁশী শুনে চন্দ্রকান্ত মুগ্ধ হয়। হয়ত বা বলে,—বাঁশী বাজালেই পারতেন, আবার মানুষমারা কলে ঢুকলেন কেন ?

কুঠির নাম 'মানুষ মারা কল।'

রতন হাসে,—কালে দেখবেন, ওতেই মানুষ বাঁচবে।

চন্দ্রকান্ত সুদূর প্রসারী দৃষ্টিপাত করে বলে,—ঠিক উল্টো, আমার মনে হয়, যারা এ কল আজ করছে, তারাও একদিন মরবে।

রতন তর্ক না করে বলে,—হতে পারে। মরাটাই ত' সংসারের সত্যি। একদল মরে আর একদল আসে। শুনুন, একটি পটদীপ সুরের আলাপ শুনুন।

পটদীপে তান ধরে রতন বাঁশীতে।

চন্দ্রকান্ত মাথা নীচু করে বসে থাকে। মদ খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে চন্দ্রকান্ত। বাঈজীর নুপুরের লালসাও আর বেশী দেখা যায় না তার। হয়ত বা মাঝে মাঝে রাত্রি ভোর হয়ে যায়। কিন্তু সব দিন নয়।

নায়েব অনন্ত ঘোষালের কাজকর্ম কিছু কিছু দেখতে সুরু করেছে চন্দ্রকান্ত। অনন্ত ঘোষাল অবাক হয় তার আকস্মিক পরিবর্তনে। খাজনার বিনিময়ে কোন দরিদ্র প্রজার ভিটে নীলামের কথা শুনলে টাকার লোভে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয় যেন।

দিন দিন কি বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাচ্ছে তোমার?

অনন্ত ঘোষাল ধমক খেয়ে হতবুদ্ধি হয়।

মাপ করে দিতে পারো না এই কটা টাকা। কি হবে আমার গরীব লোকটার ভিটে-মাটী উচ্ছেদ করে! অনন্ত ঘোষাল নীরব। মাপ হয়ে যায় খাজনা।

কোন ডানপিটে যুবক চাষীর ছেলে হয়ত বা জমীদারের নামে একটা কুকথা বলে ফেলেছে। কথাটা কানে আনে কোন গোমস্তা চন্দ্রকান্তের। আগে হলে চন্দ্রকান্ত তার আটকঘরের বন্দোবস্ত করত। কিন্তু এখন সেই জোয়ান ছেলেটাকে ডেকে পাঠায়।

শুধোয়,—বলেছিস খাজনা চাইতে গেলে আমার লোককে মারধর করবি?

ছেলেটা নীরব।

চন্দ্রকান্ত তাকে তার বরকন্দাজের পদে বহাল করে মাসিক সাত টাকা মাইনে খাওয়া পরা।

রাজার চাকরী।

গোমস্তা অবাক। নায়েব অবাক। ছেলেটাও অবাক।

ইদানীং একদিন অনন্ত ঘোষালকে ডেকে বলছিল চন্দ্রকান্ত,—আটকঘরগুলো ত' খালিই পড়ে আছে। ওটা ভেঙে কি করা যায় বলত?

অনন্ত ঘোষাল ধমকের ভয়ে কথা বলতে সাহস পায় না।

চন্দ্রকান্ত নিজেই বলে,—ভাবছি ওটা ভেঙে আর একটা বড় টোল করে দোব। কয়েকজন ভাল পণ্ডিতের খোঁজ কোরত!

টোল হবে আটকঘরে! অনন্ত ঘোষাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কিন্তু, তাহলে চোর ছ্যাচোড়দের আটক করবেন কোথায়?—বলতে চায় অনন্ত।

সে দেখা যাবে। তোমাকে যদি আটক রাখবার দরকার হয়, জায়গা করে নেবো।—হাসতে থাকে চন্দ্রকান্ত।

কুঠি শেষ হতে চলল—শেষ হয়ে গেল জমীদার চন্দ্রকান্তর বিগত কলংকের দিনগুলো।

কুঠির প্রতিটি ইটের গাঁথুনী যেন চন্দ্রকান্তের জীবনের মোহের এক একটি অংশ কাটিয়ে দেয়। চেনাই যায় না এক বছর পূর্বের চন্দ্রকান্তকে।

রতনমনি কিছু কিছু খবর পায় নায়েব অনন্ত ঘোষালের কাছ থেকে।

অনন্ত ঘোষাল রতনমনির কাছে যায় মাঝে মাঝে। রতন জানে এ লোকটাকে তার কবলে আনা দরকার। কিছু কিছু টাকা দেয় রতন তাকে কোম্পানীর তরফ থেকে বখশিস্। টুকরো খবর পায় এটা ওটা—সেগুলো সবই রিপোর্ট লিখে পাঠাতে হয় ডাট্সন্ সায়েবের কাছে। রিপোর্টের পর ডাট্সনের গোপন আদেশ আসে ওই লোকটাকে হাত করো। পয়সা যা লাগবার লাগবে। রতন সেই মত কাজ করে চলে।

কিন্তু শুনে অবাক হয় যে চন্দ্রকান্ত মদ আর বেশী খায় না। গান-বাজনার আসরও বাদ পড়ছে মাঝে মাঝে। সব শেষ তার আটকঘর তুলে দিয়ে টোল প্রতিষ্ঠা করছে।

বলো কি ?

আর কি বলবো ;—নিশ্বাস ফেলে অনন্ত ঘোষাল,—দান ধ্যান যা সুরু করেছে তাতে কম্বল চিম্‌টে নিয়ে বৈরেগী হবার মতলব।

ছেলেপুলেদের জন্যেও কিছু রাখবে না ?

ছেলেপুলে আর কই ? একটি ত' মেয়ে, তাও বিয়ে হয়ে গেছে বর্ধমানে এক জমীদারের ঘরে।

বলে রতনমনি,—আপনিও ত' কিছু হাতাতে পারেন।

হাতাবার কি আর এখন জো' আছে। কি কড়া নজর এখন। চারদিকে যেন চোখ ঘুরছে।

রতন শুধোয়, কারণটা কি বলুন ত ?

কারণ, আমাদের মনে হয় কুঠি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু কুঠির সঙ্গে তার মদ ছাড়বার কি সম্পর্ক ?

সেইটেই ত' বুঝে উঠতে পারি না আমরা।—কুঠিতেই একটা চাকরী বাকরী দিন। আর পোষাচ্ছে না ওখানে।—অনন্ত ঘোষাল ম্লান হেসে বলে।

রতন বাঁকা হাসে,—কুঠি ত' সবসময়ই আপনাদের জন্যে খোলা থাকবে। কুঠি সমন্ধে জমীদার মশাই কিছু বলেন নাকি।

—না, তেমন কিছু শুনিনি।—উঠি উঠি করে অনন্ত ঘোষাল।

কিছু টাকা আজও দিতে হয় রতনকে।

অনন্ত ঘোষাল চলে যায়। চুপ করে বসে থাকে রতন। ভবিষ্যতের এক বিরাট স্বপ্ন ওর চোখের সামনে ওঠানামা করে। কি জানে এর শেষ কোথায় ?

১৩

চন্দনডাঙার রেশম কুঠির প্রধান কুঠিয়াল স্পুণার সায়েব পৌঁছায় দিন কয়েক আগে। কুঠির কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হতে চলেছে। রোনাল্ড ডাট্‌সন্ একবার এসেছিলো কুঠির উদ্বোধনের দিন। উপস্থিত ছিল চন্দ্রকান্ত মাথায় জরীর পাগড়ী আর চাপকান পরে। চন্দ্রকান্তের হাতখানা ধরে সজোরে ঝাঁকিয়ে বলেছিলো ডাট্‌সন্—আপনার সাহায্য আমরা আন্তরিক ভাবেই প্রার্থনা করি।

বলেছিলো চন্দ্রকান্ত একটু হেসে,—যতত্থুর সম্ভব আপনাদের সেবা করতে প্রস্তুত আছি। স্পুণারকে দেখিয়ে বলেছিলো ডাট্‌সন্,—মিঃ স্পুণারই এখানকার চার্জ নিয়ে আসবে। স্পুণার হাতে হতে দিলো। তার দিকে তাকাল চন্দ্রকান্ত প্রখর দৃষ্টিতে। কটা চোখ আর কটা গোঁপের তলায় একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ওকে.ব্যঙ্গ করে উঠলো যেন। কথা বলে না চন্দ্রকান্ত একটু হাসলো মাত্র।

লোভী বিড়ালের নত সাবধানী বুদ্ধি এদের। ওপর থেকে টের পাবার উপায় নেই। লোকগুলো মুখে ভারী ভদ্র।

হাসলো মনে মনে চন্দ্রকান্ত।

অতিরিক্ত ভদ্রতার পিছনে গূঢ় অভিসন্ধি ওদের চন্দ্রকান্তের জানতে বাকী নেই।

বিয়ার হুইস্কি চললো অনেকরাত পর্যন্ত সেদিন। চন্দ্রকান্ত হুইস্কি ছুঁলো না। রতনমনি পাগড়ী মাথায় দিয়ে রাজপুত্রের মত বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এধার ওধার।

একবার এসে সেধে গেল চন্দ্রকান্তকে,—একটু বিয়ার ? তাও নয় ?

—না।—গম্ভীর উত্তরই এলো চন্দ্রকান্তের মুখ থেকে।

রতনমনি বললো,—কেমন দেখলেন সায়েবদের ?

—ভালোই।

—বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ? চলুন,—নিজে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় নীলমণি তরফদারের সঙ্গে।

নীলমণি তরফদার ভাঁড়াড়ে ব্যস্ত ছিল তার ওপরই আজকের উৎসবের সব ভার দিয়েছিল ভাট্সন্। মাঝে দু'একবার শুধু ভাট্‌সন্ তরফদারের পিঠ চাপড়ে গিয়েছিলো তার তদারকীর তারিফ করে।

সাধারণের জন্যে সেদিন লুচি মাংসের ছড়াছড়ি।

দশবারো খানা গ্রাম ভেঙ্গে মানুষ এলো। এলো না শুধু একরামপুরের একটা তাঁতি।

গুপীনাথের হুকুম।—যে জলগ্রহণ করবে আজ কুঠিতে, গো-রক্ত খাবে সে।

কথাটা পণ্ডিত জানালো রতনমনিকে। রতনমনি জানালো তার বাবাকে। নীলমণি তরফদার চোখ টিপে বললে,—চেপে যা। সায়েবদের বলবার দরকার নেই।

চেপে গেল রতন। সায়েবরা টের পেলো না কিছুই।

কানাইও সেদিন আসতে পারেনি।

পরে জানিয়েছিল রতনকে,—রাস্তায় বেরোতেই সামনে পড়ল তিনটে জাঁদরেল তাঁতি—মানে একেবারে লাঠি হাতে। মাথায় একবার হাত বুলিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকলুম। আর বেরোইনি।

আসলে কিন্তু কানাই সেদিন বেরোয়নি একেবারে। লাঠিধারী তাঁতির কাল্পনিক গল্প কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারে না রতন ওর চোখমুখের ভাবভঙ্গী দেখে।

বলে,—লোক তিনটেকে চেনো ?

—বিলক্ষণ।

—কি নাম ?

—আজ্ঞে এই পেল্লাদ আর ইয়ে কি বলে—

—থাক্ নামগুলো আমায় লিখে দিও আপিসে।

কানাইও বেঁচে যায়—তখুনী তখুনী নাম বানিয়ে বলার দায় থেকে বেঁচে।

পরে অবশ্য প্রহ্লাদ আর মনোহর তাঁতির দুটো জোয়ান ছেলের নাম দিয়েছিল রতনকে।

কুঠির কাজ সুরু হবার আগের দিন রতন সন্ধ্যায় বললে পণ্ডিতকে,—আপনার এখান থেকে কাল সকালেই চলে যেতে চাই। পণ্ডিত হাতজোড় করে বনেদী ভঙ্গীতে বলে,—কেন, কিছু অপরাধ হয়েছে কি?

না। তা কিছু নয়। এমনিই। কুঠিতেই থাকব এখন থেকে।

পণ্ডিত একটু আপত্তি করতে চায়,—এখানে থাকলেও ত' হোত,—যদি অবিশ্যি আপনার অসুবিধে না হয়।

থাক না পণ্ডিত মশাই, পরে যদি দরকার হয় আবার আসা যাবে।—স্মিতহাস্যে বলে রতনমনি, পণ্ডিত আর কথা না বলে বেরিয়ে যায়।

কথাটা চন্দ্রার কাণে যায়। চন্দ্রা কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করে না। যথারীতি খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে সবাই।

শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ তখন ঢলে পড়েনি পশ্চিমের শেষে। রাত গভীর কিছু বর্ষণ হয়ে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা জোলো বাতাস বইছে থেকে থেকে। ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। চাঁদের আবছা আলো জানালা দিয়ে দেখা যায় গভীর ঘুমে মগ্ন রতন।

ওর ঘরের দরজাটা খুলে যায়। রতনের হাতের ওপর একটি হাত রেখে ওর কপালে আঙুল রাখে। ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে রতনমনির ঘুম ভাঙে, ভয় পেলেও একটু সজাগ হয়েই বুঝতে পারে রতন যে কে আসছে। তবু শুধোয়,—কে?

আমি।—কণ্ঠস্বর অশ্রুভারাক্রান্ত, তবু চন্দ্রাই এসেছে বোঝা যায়।

এত রাতে! কিছু বলবেন আমাকে?

নীরবে বসে থাকে চন্দ্রা। রতনমনির হাতের পাতার ওপর এক ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল পড়তেই রতনমনি চমকে ওঠে,—কাঁদছেন?

খানিক পরে পাল্টা প্রশ্ন আসে,—এখানে থাকলে হয় না?

না।

যেতেই হবে?

হ্যাঁ।

তবে বলে যান কখন আবার দেখা পাব?

একটু পরে বলে রতন,—প্রত্যেক শনিবার রাত বারোটার পরে।

ঠিক ?

ঠিক।

আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করুন।

আমার কথায় বিশ্বাস করুন।

আবার দুজনে কিছুক্ষণ নীরব। বাতাসে ভেজানো দরজার একটা পাল্লা সশব্দে খুলে যায়। দুজনেই চমকে ওঠে।

যান এবার রাত হোল।—মনোবেদনা নিয়ে বলে রতন।

চন্দ্রা ফিসফিস্ করে বলে,—ঘুমোন তারপর আমি যাব।

ঘুম আমার আসবে না। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ওঠে রতনমনি। চন্দ্রাও ওঠে।

উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে, দিয়ে ফিরে আসে রতন। বড় বড় কোঁকড়া চুলগুলো সাপ্‌টে পিছন দিক দিয়ে ঘরে আসে।

চন্দ্রা গিয়ে ঘুমন্ত পণ্ডিতের পাশে নীরবে শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরেই ওর কানে আসে বাঁশীর সুর, একটি কীর্ত্তন। মধুর বিরহের কথা যেন কানে কানে এসে জানিয়ে যায় সুরের বিস্তার। বহু যুগ আগের গোপীদের বেদনা বিলাপ, আজও চোখে দেখা যায় যেন। রতনের বাঁশী সেই চিরকালের বুভুক্ষায় ভাষা বলে যায়। শুধু না পাওয়ার ভাষা।

চন্দ্রার চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। মুখে আঁচল গুঁজে দেয় পাছে শব্দে পণ্ডিত জেগে ওঠে। রতনমনি সেই ছোট মাঠটিতে বসে বাঁশীতে মন প্রাণ ঢেলে দেয়।

রাত কত হোল কে জানে। সময়ের জ্ঞান কারই বা আছে !

পরদিন ভোরে উঠে চলে যায় রতন। যাবার সময় চন্দ্রাকে দেখা যায় না না বাইরে। রান্নাঘরে রান্নাতেই গভীর মনোনিবেশ করে চন্দ্রা। রতন একবার এদিকে ওদিকে তাকায় তারপর পণ্ডিতকে বলে, কুঠিতে বিছানা বাক্স পাঠিয়েছেন ত' ?

যে আজ্ঞে!

আজ দুপুরে আসছেন ত'?

নিশ্চয়ই।

বিদায় নেয় রতন। আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে কুঠির দিকে এগোয়।

সেইদিন থেকেই কুঠির কাজ সুরু হোল। খাতাপত্র ঠিক করা, ঘরদোর ঝাড়া-মোছা, সায়েবের কামরা গুছিয়ে রাখা। সায়েবের টেবিল চেয়ার রতনমনির টেবিল চেয়ার আর সব কর্মচারীদের ফরাস মাদুর।—সবই গুছোন হয়।

আর দিন দুয়েক কাটে, তৃতীয় দিনে আসে প্রধান কুঠিয়াল ই, জি, স্পুণার। রতন তাকে আনতে যায় পাল্কী নিয়ে। কুঠিতে এসে তার নিজের ঘর অপিস্ সাজান গোছান দেখে খুসীই হয় স্পুণার। পাইপ গোঁপের ফাঁকে পুরে দিয়ে একটু বাঁকা হেসে মুণ্ড নেড়ে জানায়—ঠিক হ্যায়।

রতন তাকে সব ঘুরিয়ে দেখায়, কার কোন ঘর, কে কোথায় কাজ করবে।

স্পুণারের খাওয়ার ব্যবস্থাও করা ছিল। রতন জানত। মাংস রুটি শশা কলা সবই ঠিক করে, রেখেছিল যেমন করে ঠিক করে রাখত ওর বাবা ডাট্সন্ সায়েবের জন্যে! স্পুণার খুব খুশী।

খাওয়ার পর পুরো দুগ্লাস বিয়ার খেয়ে স্পুণার আপিসে বসলো। শুধোল রতনমনিকে,—বিয়ার হুইস্কি পাওয়া যাবে ত'?

রতন হাসে,—বলো কি সায়েব। এখানে বিয়ার কোথা পাবে। সদর থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে আনিয়ে নিতে হবে।

মনে মনে বলে,—ব্যাটা একেবারে গাধা। আজ পাড়াগাঁয়ে কুঠি করে বলে বিয়ার চাই। স্পুণার জানায়,—ঠিক আছে, তুমি বন্দোবস্ত করে দিও। আর কালই আমাকে এ অঞ্চলের সমস্ত তাঁতিদের নাম একটা নোট করে দাও। আর কত কাপড় আমরা পেতুম, কত কাপড় ম্যাক্সিমাম্ প্রোডাক্শান করতে পারে। সব হিসেব আমায় করে দাও।

রতন চটে,—এত সব কালকের ভেতর কি করে হবে স্যার?

কদ্দিন সময় চাও। পুরো স্ট্যাটিস্‌স্টিক্‌স্ দিতে হবে আমায় সদরের কাগজ পত্র দেখে।

দিন পাঁচেক লাগবে।

বেশ পাঁচদিন পরে সব কাগজ আমি চাই। কাজে লাগিয়ে দাও সব লোককে।

একরামপুরের শুধু নয় তার আশে পাশের চত্বরের সব তাঁতিদের নিয়ে এক বিরাট চার্ট করতে লেগে যায় রতন। তার ভেতর কিছু গোপনীয় রিপোর্ট থাকে কোন কোন তাঁতির সম্বন্ধে। কাপড়ের লিস্ট হয়,—নীলাম্বরী, সুরধুনী, কাঁকড়াপেড়ে, কলাবতী, সর্বসুন্দরী, খড়কেমুটী, সিঁদুরী, চৌরঙ্গী, তাসখুপী, চৌখুপী, আয়নাখুপী, চৌটেক্কা পেড়ে, অাঁসপেড়ে,—আরও কত কুড়ী নাম। প্রত্যেক সাড়ী ধুতীর দাম পাশে পাশে লেখা। প্রথমে কেনা দাম, হাটের দাম, ব্যাপারীদের কাছে বেচবার দাম। তার পাশে দিনে প্রত্যেক তাঁতি কত করে কত রকম কাপড় তুলতে পারে তার আন্দাজ। সব মিলিয়ে যেন এক বিরাট ব্যাপার করতে লেগে যায় রতন। সঙ্গে পণ্ডিত, কানাই।

পাঁচদিন পরে কাগজগুলো সব দাখিল করে রতন স্পুনার সায়েবের কাছে। স্পুণার কাগজ দেখে খুসী। বলে,—এই তাঁতিদের কাল ডেকে পাঠাও। আর জেলার অন্য তাঁতিদেরও নিকট আমি আগামী হপ্তায় চাই।

কানাইকে পাঠান হয় একরামপুর। পণ্ডিত যেতে চায় না।

রতন মুচকী হেসে বলে,—কেন পণ্ডিন মশাই-ই যান না।

বুড়ো বয়সে পণ্ডিত খুব আপত্তি জানায়,—দোরে দোরে ঘোরা, তাছাড়া আমি সব চিনিও না, কেনো আমার চেয়ে একরামপুর ভাল ভাবে চেনে, তাই বলছিলুম—।

যাক্ কানাই যাবে।—কানাইকে রতন বলে দেয়, প্রত্যেক বাড়ীতে বলে আসতে বিশেষ করে—গুপীনাথকে কাল বিকেলে কুঠিতে আসবার জন্যে।

কানাই একটু মাথা চুলকে বলে,—যদি না আসে হুজুর?

না আসে,—একটু থেমে বলে রতন,—কোম্পানীর সিপাই বরকন্দাজ—যাবে তারপর।

কানাই বলে,—আমার সঙ্গেই তুটো সিপাই দিন—হুজুর—ওই তলওয়ার ঝোলান।

বেশ নিয়ে যেও।

তুপুরে স্পুণারকে বলে রতন কানাইয়ের কথা,—বলে ত' 'পাঠিয়েছি যদি না আসে স্তার?

না আসে।—স্পুণার গোঁপের ফাঁকে পাইপটা নামিয়ে ঘরের কোণে গাদা বন্দুক তিনটের দিকে একবার তাকিয়ে হাসে।

রতন আর কিছু বলে না।

১৭

গুপীনাথের বাড়ী সকালেই সভা বসে। তলব এসেছে কুঠি থেকে। কি করা যায়! মনোহর, প্রহ্লাদ, নীলকেষ্ট, গদাই, মাধাই, মনোহরের ছেলেরা আরও সব তাঁতিরা জমায়েত হয়েছে।

গুপীনাথ বলে,—সব কাপড় আমরা দাঁদন চুক্তিতে দোব না। কিছুতেই না।

না।—সমবেত কণ্ঠে বলে সবাই।

চোরাই করতেও পারব না আর, সায়েবকে বলব স্পষ্ট তাকে দোব অর্ধেক আর অর্ধেক আমরা হাটে খুচরা বেচব। কিন্তু তাতে যদি সায়েব না রাজী হয়।

সকলের মুখে রা' নেই। তাহলে কি হবে?

রাজী না হলে না হবে। আমাদের কথা আমরা বজায় রাখব এতে খুন খারাপি যদি হয় ত' হবে। সবাই রাজী আছো?

সব রাজী।

প্রাণ দিতে পারবে দরকার হলে—?

পারব।

প্রহ্লাদ হাত দুটো কচলাতে থাকে। সকলেই কিছুটা উত্তেজিত। কে জানে আজ বিকেলে কি হয়! কে জানে কাল সন্ধ্যায় কটা তাঁতির রক্তে একরামপুরের জলাটা রাঙা হয়ে ওঠে।

বাড়ী চলে আসে সবাই।

কিছুক্ষণ পরেই তলব আসে গুপীনাথের জমীদারের কাছ থেকে—জরুরী।

গুপীনাথ যাবার সময় প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

জমীদার বাড়ী কাছারীতে গিয়ে ওঠে। অনন্ত ঘোষাল তাদের দেখেই বলে,—তোমরা এখানে কেন, তোমার বাবুর অন্দরে যাও।

অন্দরে। ওরা যেন অবাক।

হ্যাঁ, অন্দরে,—একটা খানসামাকে ডেকে গুপীনাথকে অন্দরে নিয়ে যেতে বলে ঘোষাল।

গুপীনাথ প্রহ্লাদকে সঙ্গে নেয়। কে জানে বুড়ো মানুষ, কি থেকে কি হয়, প্রহ্লাদ সঙ্গে থাকা ভাল। প্রহ্লাদ এখন গুপীনাথের ডান হাত।

অন্দরে জমীদার তাকিয়া হেলান দিয়ে শোবার ঘরে বিশ্রাম করছিলেন।

গুপীনাথ প্রহ্লাদ গিয়ে প্রণত হয়।

হাত তুলে চন্দ্রকান্ত হেসে বলে,—বোস।

ওরা বসে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বলে চন্দ্রকান্ত,—তোমাদের কি কুঠি থেকে সায়েব ডেকে পাঠিয়েছে?

আঁজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর?

তোমরা যাবে?

হুজুর যা বলেন, তাই কোরব।—বলে গুপীনাথ।

যাবে বই কি যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। ওদেরই ত এখন রাজত্ব। নবাব ত নামে মাত্র। আচ্ছা তাঁত কখানা সবাই কি ওদের কাছে বিকোবে?

আজ্ঞে না হুজুর।

কাপড় সব দেবে না।

না।

যদি জোর করে।

হুজুরের ভাত খেয়ে আমাদেরও গায়ে কিছু জোর আছে।

চন্দ্রকান্ত হাসে। কথা বলে না।

কিছুক্ষণ পর বলে,—যাও। এই জন্যেই ডেকেছিলাম। কোন গোলমাল হলে খবর দিও।

যে আজ্ঞে হুজুর।

বেরিয়ে আসে গুপীনাথ প্রহ্লাদ চন্দ্রকান্তকে প্রণাম জানিয়ে।

সূর্য নিয়মিত গতিতে পশ্চিমে হেলে পড়ে। তাঁতি পাড়ার সরগোল পড়ে যায়। তাঁত প্রণাম করে মা বাপের আশীর্বাদ গিয়ে মোড়লকে প্রণাম করে সবাই চলে গুপীনাথের পিছন পিছন। গুপীনাথের ডান দিকে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের মনটা একটু খারাপ। কিছুক্ষণ আগে নীরু ওকে ডেকেছিল তার ঘরে। নীরুর জ্বর আজ কদিন ধরে। নিজে আসতে পারেনি তাই। ঘরে গিয়ে শায়িত নীরুকে দেখে প্রহ্লাদ বলতে পেরেছিল,—কেমন আছিস ?

বোস, কথা আছে।

প্রহ্লাদ বসল তফাতে।

কাছে এসে বোস।

বিছানার কাছে যেতে এবার সাহস করল প্রহ্লাদ।

আঃ !—নীরু মুখ ফেরায়,—আরও কাছে।

নীরুর শিয়রের কাছে সরে প্রহ্লাদ।

ভাবতে ভাবতে প্রহ্লাদের চোখ পড়ে সড়কের সামনে পলাশ গাছটার উপরে। অস্তোন্মুখ সূর্য হেলে পড়েছে পলাশ গাছটার মাথার উপর। ওমনি করেই হেলে পড়তে হয়েছিল প্রহ্লাদকে নীরুর কাছে। নীরু কোন ভূমিকা না করেই বলেছিল,—পিতিজ্ঞে করো দাঙ্গা হাঙ্গামা করবে না।

প্রহ্লাদ প্রথমটা কথা বলতে পারেনি।

নীরু আবার বলেছিলো হাতটা বাড়িয়ে,—বলো, দিব্যি করে বলো।

প্রহ্লাদ মৃদু হাসে,—এত করে আমাকে কেন আটকাস বলত ?

আমার খুসী। খুন জখম করে যখন মারা পড়বে, তখন ঠিক হবে।—একটু যেন উত্তেজিত নীরু।

বেশ।—মৃদু স্বরেই বলে প্রহ্লাদ,—লাঠি ধোরব না আজ, পিতিজ্ঞে কর্‌চি।

নীরু একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুখ ফেরায়,—যাও। গোলমাল বেশী দেখলে চলে এসো।

প্রহ্লাদ বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো তখন। মাকে প্রণাম করে তাঁতের বেদীর মাটি মাথায় নিয়ে রওনা হোল চন্দনডাঙার দিকে।

পৌছতে পৌছতে ওদের প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসে। হাতের লণ্ঠন জ্বালায় ওরা। ভীড় করে দাঁড়ায় কুঠির সামনে। রতন বেরিয়ে আসে। কানাই পণ্ডিত দোরের কাছে এসে দাঁড়ায়, বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার স্বামনে তিনটে সেপাই।

রতন বলে ওদের উদ্দেশ্যে,—তোমাদের মোড়ল গুপীনাথ কই ?

গুপীনাথ এগিয়ে আসে।

তুমি আর দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সায়েবের কাছে এসো।

গুপীনাথ, মনোহর আর প্রহ্লাদ এগোয়।

বিরাট চাতাল পার হয়ে সাহেবের খাস কামরায় এসে হাজির হয় ওরা।

তিনজনেই এই প্রথম সায়েব দর্শন করে। টক্‌ টকে লাল মুখোর মত মুখ। বিড়ালের মত চোখ। পাটের রঙের চুল আর গোঁপ।

হাতে ছোট একটি রুল নিয়ে স্পুণার তাকায় ওদের দিকে।

স্পুণারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ওদের হৃদয় ভেদ করে।

ভেতরটা কেঁপে ওঠে গুপীনাথের মনোহরের—প্রহ্লাদের নয়।

স্পুণার আর একবার তাকিয়ে বলে রতনকে,—এদের জিজ্ঞেস করো এরা সব কাপড় কুঠিতে দিতে পারবে কিনা ?

রতন বাংলায় শুধোয় গুপীনাথকে।

গুপীনাথ ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, প্রহ্লাদের দিকে তাকায়। প্রহ্লাদ বলে,—না। সব দিতে পারবো না।

'না' কথাটা বোঝে সায়েব। কিছু কিছু বাংলা রপ্ত করেছে এদেশে এসে। বলে রতনকে,—কেন, না কেন?

তাহলে না খেয়ে মরে যাব হুজুর।—গুপীনাথ বলতে পারে এতক্ষণে,—কুঠির যে দর, তাতে সব কাপড় দিলে আমাদের ধান কেনবার পয়সাও থাকবে না।

রতন বলে সে কথা স্পুণারকে।

স্পুণারের মুখটা যেন আরও লাল হয়ে যায়।

পাইপটা ধরিয়ে গোঁপের তলায় হাসে। বলে,—কেন কুঠি ত' খারাপ দর দেয় না।

গুপীনাথ বলে,—হাটের অর্ধেক দর পাই হুজুর।

যদি বলি দিতে তোমাদের হবে।—

গুপীনাথ কথা বলে না।

তাহবে দেবে না।

না।—স্পষ্ট বলে আবার প্রহ্লাদ।

স্পুণার প্রহ্লাদের দিকে তাকিয়ে শুধোয় রতনকে ইংরেজীতে,—এ লোকটা কে?

রতন নাম বলে।

স্পুণারের মূর্ত্তি অকস্মাৎ পালটে যায়। একগাল হাসি মুখে এনে বলে,—দেখো, আমি তোমাদের ওপর জবরদস্তি করবার জন্যে কুঠি করিনি। মাল যদি সব দাও, তবে নিতে পারি। তাতে তোমাদের ভাল হবে। বিপদে আপদে তোমাদের আমিই দেখব। আর যদি সব না দাও, তবে নোব না। কেননা অর্ধেক সিকি মাল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে হাটে বাজারে পাল্লা দেবার দরকার আমার নেই। সব যদি দাও তোমাদের ভাল হবে।

দেবে?

গুপীনাথ প্রহ্লাদের নির্ভিক ভাবভঙ্গীতে জোর পেয়ে বলে,—পারবো না হুজুর।

পারবে না।

না।

কিন্তু আমি যদি বলি তোমারই আবার আমার কাছে আসবে।

গুপীনাথ অবাক।

স্পুণার পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে,—বেশ, যাও এখন। ছমাস পরে তোমরাই শেষে কাপড় দিতে আসবে আমার কাছে। তখন আমার কাছ থেকে কি ব্যবহার চাও।

ছমাস পরে আসবো না।—বলে প্রহ্লাদ।

স্পুণার হাসে,—আচ্ছা যাও। তোমাদের কাপড় আমার প্রয়োজন নেই।

গুপীনাথ ওরা অবাক হয়ে বেরিয়ে আসে।

এত সহজে সায়েব রেহাই দিলে তাদের এ যেন অবাক কাণ্ড। তবু আনন্দে ওদের বুক ভরে উঠল, এতদিনে তারা স্বাধীনভাবে হাটে বাজারে কাপড় বিকোতে পারবে। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন!

কুঠিতে কাপড় একখানাও দিতে হবে না শুনে তাঁতিরা উল্লসিত হয়ে উঠল। চীৎকার করতে করতে সব চলল একরামপুরের দিকে নিজেদের জয় ঘোষণা করে।

ওদের উল্লাসের ব্যর্থতার কথা ভেবে মনে মনে হাসছিল স্পুণার খাস কামরায় বসে। হুইস্কির বোতল খুলে বসল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে। হুইস্কির বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবে ওদের ব্যর্থ উল্লাস।

১৫

রাস্তা থেকেই গুপীনাথ প্রহ্লাদের ওপর ভারী খুসী। বলে ফেলে সকলের সামনে,—আজ সকলের মুখ রেখেছে পেল্লাদ। ও যেন আগের জন্মে আমার ছেলে ছিল। তবে ব্যাটা একটু বাড়াবাড়ি করেছে। সায়েবের মুখের ওপর অমনধারা কড়া কথা আর বলিসনি, বুঝলি?

কেন বোলব না,—আনন্দ চেপে বলে প্রহ্লাদ,—কিছু অনেয্য কথা ত' বলিনি? নেয্য যা তা বুক ঠুকে বোলব।

গুপীনাথ খুব খানিকটা হেসে নেয়,—ওঃ! কি আমার রাজার ব্যাটা নবাব!

প্রহ্লাদের সাহসে আর তেজে গল্প রচনা হয়ে যায় ওর নামে ঘরে ঘরে কিছুক্ষণের ভেতর। কেউবা বলে,—আর একটু হলেই ত' বন্দুক মেরে দিয়েছিল পেল্লাদকে! এমন ডাকাত ছোঁড়াটা।

বধু বৃদ্ধারা শুনে আঁতকে ওঠে,—দুর্গা দুর্গা—তারপর?

তারপর সায়েবকে মুখের ওপর থুড়ে দিলে পেল্লাদ। ভাগ্যি হাতে লাঠি ছিল না, নইলে হয়ত বা মাথায় বসিয়েই দিত সায়েবের।

হয়ত বা বলে আর একজন,—বাইরে যখন বেরিয়ে এলো পেল্লাদ, চোখ দুটো তার জবাফুলের মত রাঙা। মা বটেশ্বরী ভর করেছিলো ওর ওপর। নইলে কি আর অমন লাফিয়ে তেড়ে মেড়ে কথা বলতে পারে সায়েবের মুখের ওপর।

মেয়েরা বলে,—কি গুণ্ডো ছেলে বাপু!

আবার কেউ বা,—এমন নইলে ছেলে!

প্রহ্লাদ এই সমালোচনায় বিব্রত হয়ে পড়ে। দু এক জায়গা থেকে এই ধরণের আলোচনা কাণে আসতেই সে ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে থাকে। বিব্রত বোধ করে, সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলেছে, এতে বাহাদুরীর কি আছে সে ভেবে পায় না।

প্রহ্লাদের বুড়ো মা বলে,—হাঁরে, তুই নাকি লড়াই করে এইচিস্?

ক্ষেপেচ নাকি?—চলে যায় প্রহ্লাদ তাঁত ঘরে।

তাঁত ঘরে গিয়ে অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকে। পাইটকরা সুতোগুলো হাতে লাগে প্রহ্লাদের। কাঠের রোলায় জড়ান অর্ধেকটা বোনা হয়ে গেছে সাড়ী একখানা। পাড়ে থাকবে মুক্তোমালা আর আঁচলায় চাঁদমালা।

সাড়ীখানা মনের মত হচ্ছে বটে, হাটে দর উঠবে বেশ।

দর বেশী নিয়ে সে কিই বা করবে। ইচ্ছে হয় কাউকে যদি দিয়ে দেয়া যেত সাড়ীখানা! কে আর নেবে? প্রহ্লাদের সাড়ী নিয়ে কেই বা কিনবে বদনাম। কলংক রটতে ত' এক মুহূর্ত্তও লাগে না। রত্নবাবু নেবে বলেছিল কানাই।

রতনবাবুকেই দিয়ে দেয়া যাবে একটু চড়া দামে। কুঠির লোক বলে একটু খাতিরও পাবে না সে প্রহ্লাদের কাছে।

প্রহ্লাদ ওঠে।

যাই একবার নীরুর কাছে। এত মানুষ ত' তার প্রশংসা করছে, নীরুর মুখে কিছু শুনলে তবে প্রাণে বাহার লাগত।

খুসী ভরা মন নিয়ে নীরুদের বাড়ীর দিকে যায় প্রহ্লাদ। অন্ধকারে নীরুর ঘরের দাওয়ায় গিয়ে ওঠে। বাইরে থেকেই শোনা যায় নীরুর ভাই গোবিন্দ—গবার নাক ডাকছে। নীরুও কি ঘুমুল নাকি।

দোরটা একটু ঠেলে দেখে দোর বন্ধ ভেতর থেকে।

দাওয়ার এপাশে খুপরীর মত একটু জানালা জানালা দিয়ে পা উঁচু করে উঁকি মারে প্রহ্লাদ। একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে টিম টিম করে, আবছা আলোয় দেখা যায় নীরুকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

প্রহ্লাদ মুহূর্তে সংযম হারিয়ে ডেকে ফেলে,—নীরু!

নীরু বোধ হয় জেগেই ছিল জ্বরের যন্ত্রণায়। হঠাৎ চমকে চেঁচিয়ে ওঠে,—কে?

কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে এ কার গলা।

গবা উঠে পড়ে,—কে, দিদি। দেখব কোন শালা এলো?

নারে কেউ না। বোধহয় শেয়ালের ডাকে চমকে উঠেছিলাম। তুই ঘুমো।

প্রহ্লাদ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

চাঁদ উঠছে ক্রমশঃ মেঘ ভেদ করে। আবার ঢাকা পড়ছে মেঘে।

দরজাটা খোলবার একটু শব্দ হয়, গবার নাক ডাকার শব্দও হয়।

হাতে প্রদীপটা নিয়ে নীরু বেরিয়েছে। মুখখানা জ্বরে শুকিয়ে গেছে।

কি জানি আজ প্রহ্লাদের প্রাণটা কেমন করে ওঠে ওকে দেখে।

ফিস্ ফিস্ করে ডাকে দাওয়ার অপর প্রান্ত থেকে,—নীরু!

নীরু শব্দ শুনে ওর কাছে আছে। ওর দিকে আলোটা বাড়িয়ে দেখে।

কি ভেবেছ বলোত?

প্রহ্লাদ অপরাধীর মত চুপ করে থাকে।

তুমি কি আমার জাত মান খোয়াবে? কেন এসেছ এখানে চোরের মত?

ফস্ করে বলে প্রহ্লাদ,—তোকে দেখতে।

প্রহ্লাদের সাহস দেখে আজ অবাক হয় নীরু। ওর হাতের প্রদীপ কাঁপে।

একে জ্বরে আর অনাহারে শরীর দুর্বল, তারওপর রাগে দুঃখে যেন ভেঙে পড়তে চায় নীরু,—

বুদ্ধি সুদ্ধি কি তোমার কোনদিন হবে না?

প্রহ্লাদ ধমক খেয়ে একটু দমে যায়।

নীরু বলে,—এত রাতে এমনভাবে যে আমার কাছে আসতে নেই।

ইচ্ছে হোল প্রহ্লাদের বলে যে সেদিন বিয়ের রাত্রে যে একা একা প্রহ্লাদের সঙ্গে ফিরেছিল, তাতে কি কোন দোষ হয়নি? আজই যত দোষ হোল?

প্রহ্লাদকে নীরব দেখে অসহ্য লাগে নীরুর, বলে—যাও না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কিন্তু তার আগেই সামনে শব্দ শুনে ওদের নজরে পড়ে কে একজন আসছে সরু রাস্তা ধরে।

মুহূর্তে প্রহ্লাদ নীরুর হাতের প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়।

ভয়ে লজ্জায় নীরুর মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয়।

ওদিক থেকে শব্দ আসে,—ওখানে দাঁড়িয়ে কে রে?

নীরু সাড়া দেয়,—আমি মাধব কাকা। কি যে মুস্কিল বাতিটা হাওয়ায় নিভে গেল।

বৃদ্ধ মাধব জেলে যাচ্ছিল জাল কাঁধে। আর কথা না বলে চলে যায়।

চলে যেতেই প্রহ্লাদ নীরুর একখানা হাত চেপে ধরে,—নীরু!

আজ কি প্রহ্লাদকে ভূতে পেল।

বিদ্যুদ্বেগে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নীরু বলে,—ছি! যাও বাড়ী, যাও।

প্রহ্লাদের গলা কাঁপে,—নীরু!

তোমার পায়ে পড়ি কালো বাড়ী যাও।

বহুদিন পরে নীরুর মুখে কালো, নামটা শুনে প্রহ্লাদের ভারী ভাল লাগে। বলে,—শুনেছিস, কুঠিতে আমাদের আর কাপড় দিতে হবে না।

সব শুনেছি, সব শুনব কাল। আজ যাও।

তবু বলে প্রহ্লাদ,—এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছিস কেন বলত ?

নীরুর দুঃখও হয়, মায়াও হয় প্রহ্লাদের নিতান্ত ছেলেমানুষীতে, বলে—কেন তাড়াচ্ছি, তা যদি বুঝতে—তাহলে তোমার জন্যে এত জ্বালা আমার হোত না।

আর একটু দাঁড়িয়ে প্রহ্লাদ একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা যাই।

নীরু এবার আস্তে স্নেহভরা কণ্ঠ নিয়ে বলে,—রাগ কোরনা যেন। কাল দুপুরে একবার এসো।

প্রহ্লাদ কথার উত্তর না দিয়ে চলে যায়।

নীরু অনেকক্ষণ নেভা প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে দাওয়ার উপর। সামনে ছোট ছোট ঝোঁপ জঙ্গলের পাশে পাশে জোনাকি আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা শব্দ কানে আসে। চাঁদের আধো আলোয় প্রহ্লাদের ছায়ামূর্ত্তি মিলিয়ে যায় ক্রমে।

নীরু ধীরে ধীরে ঘরে এসে দোর বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছট্ ফট্ করতে থাকে। অনেক রাত হয়ে যায়। ঘুম আসে না। কোথায় যেন একটা জ্বালা ধরে গেছে নীরুর। পোড়া চোখেও জল নেই। তবু কিছু কোমত বেদনার সুতীব্র উত্তাপ চোখের জলে ভিজে।

প্রহ্লাদ বাড়ী এসে অনেকটা রাত তাঁত বুনে কাটিয়ে দেয়। অনেকটা বোনা হয়ে যায় বাহারের সাড়ীখানা। অনেক রাতে ঢাকা দেওয়া ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। মনে মনে বার বার প্রতিজ্ঞা করে কাল সে কিছুতেই যাবে না নীরুর কাছে।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথাই। দুপুরে খাওয়া সেরে ঠিক পা দুটো যেন আপনা আপনিই এগোতে থাকে নীরুর ঘরের দিকে। কে জানে কেন ডেকেছে। একবার যাওয়া যাক্, দু'একটা কথা শুনেই চলে আসা যাবে। কথার উত্তর না দিলেই ত' হোল!. উত্তর দিলেই পেয়ে বসবে। মুখটা খুব গম্ভীর করবার

চেষ্টা করতে করতে যায় প্রহ্লাদ। নীরুর ঘরে এসে দেখে, ও টেকো নিয়ে বসেছে। স্থতো কাটছে।

রোগা হয়ে গেছে অনেকটা এই কদিনের জ্বরে।

প্রহ্লাদ এসে গম্ভীর হয়ে শুধোয়,—গবা কোথায় ?

নীরু একবার ওর দিকে আড ভাবে তাকিয়ে মনে মনে হেসে স্থতো কাটতে কাটতেই মুখ নীচু করে বলে,—কেন কি দরকার ?

কাজ ছিল একটু।

কি কাজ আমাকে বলো ?

সব কাজের নিকেশ তোকে দিতে হবে নাকি ? তুই বলদিকি তবে এই শরীর নিয়ে স্থতো কাটতে বসেচিস কেন ? ব্যারাম যদি আরও বাড়ে ?

বাড়বে, মরে যাব। স্থতো কাটতে বসেছি কেন যদি শুধোয়, তবে বলব পেটের জন্তে।' স্থতো না কাটলে খাব কি ?

কেন তুনিয়া শুদ্ধ কি ভাত নেই।

কে দেবে আমায় ভাত ?

সব কি মরে গেছে ? তু' একজন ত' থাকতে পারে।

তবু ভাল তু' একজন আছে জানলুম।—মুচ্‌কী হেসে বলে নীরু,—ঝগডা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই করবে, একটু বসতে নেই ?

না নেই।—প্রহ্লাদ চটে বলে যেন।

বাব্বা ! রাগ দেখো ! ভর জীবন তুমি ভাত দিতে পারবে ?

তা তুই যদি চাস। পেল্লাদ কি পেছপা' হবে ভেবেছিস ?

আবার হাসে মুখ টিপে নীরু,—তবে চল তোমাদের বাড়ীই আজ থেকে যাই।

চল ! এক্ষুনী চল।

তা একটু বস। এই তুলোটুকুন ফুরোলে যাব।

প্রহ্লাদ যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসে।

কাল সাহেব কি বললে ?—নীরু কথা পালটায়।

জানি না।

বলো না! তুমি না বললে আমায় আর কে বলবে?

কেন, আর কেউ বলেনি?

উহুঁ

গবাও কি জানত না কিছু?

গবা কি কোন কালে কিছু জানে?

প্রহ্লাদের এবার একটু মায়া হয়। সত্যিই ত' কেই বা বলবার আছে ওর!

বলে, সায়েবকে বললুম আমরা, সব কাপড় দিতে পারব না কুঠিতে।

শুনে কি বললে?

বললে, কিছুদিন পরে কাপড় দেবার জন্যে শেষে আসতে হবে। মানে ওটা একটা হুমকী।

হুমকী তোমায় কে বললে?

সবাই বললে, মোড়লও বললে. ও সব বুদ্ধি কি আর আমরা বুঝি না! অত বোকা ভেবেছে আমাদের?

নীরু নীরবে স্থতো কাটতে কিছুক্ষণ পরে যেন চিন্তিত মুখে বলে,—আমার কিন্তু মনে হয়। এমন কিছু একটা করে বসবে যে সত্যিই হয়ত তোমাদের যেতে হবে সেধে কাপড় দিতে!

তুইও কি খেপিচিস?

সায়েবকে অত বোকা ভেবোনা। যাক্, সাহেবের চেয়ারা কেমন?

টক্‌টকে—একবারে যেন আগুনের মত ফেটে পড়চে। বেড়াল-চোখো, কটা চুল,—

একেবারে রাঙা হুলো বেড়াল!—হাসতে থাকে নীরু।

যা বলেচিস।—প্রহ্লাদও হাসে।

অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে প্রহ্লাদ, শুধোয় নীরুকে,—ভাত খেয়িচিস আজ?

নাগো, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। দেখো।

প্রহ্লাদ এগিয়ে গিয়ে ওর কপালে হাত রাখে। পুড়ে যাচ্ছে সত্যি।

এত জ্বর গায়ে তুই বসে আছিস কি করে? কোবরেজ মশাইকে ডাকলে হয়।

হাসে নীরু,—ভারী ত' অসুখ! আমার জন্যে আবার কোবরেজ। মরলে ত' বাঁচি।

তবে মর নিজে ইচ্ছে করে। চললুম আমি।

কোথা যাবে?—অবান্তর প্রশ্ন করে নীরু।

সব কথার জবাব তোকে দিতে হবে?

হ্যাঁ হবে।

কেন?

কেন না?

আচ্ছা ত্যাঁদোড় মেয়ে ত'!—বড়ই বিরক্ত হয় প্রহ্লাদ,—তর্কে পারবার জো' নেই।

তবে তর্ক আর করা কেন?

সুতো কাটা শেষ হয়ে আসে। টেকো সুতোর পাকে পাকে ফুলে ওঠে।

একরামপুরের সেরা কাটুনী নীরু। জ্বর নিয়ে আজ মাত্র বসে অনেকটা সুতো কেটে ফেলেছে। লাটাইয়ের দিকে দেখে প্রহ্লাদ।

হ্যাঁরে, তোর হাত ব্যথাও হয় না।

তাকি আর হয়!—টেকো থেকে সুতো লাটাইয়ে জড়াতে থাকে নীরু।

লাটাইয়ে সুতো জড়ান শেষ করে ওঠে নীরু। বলতে বলতে আবার মাড দাও। পাট করো তারপর তোমরা কড়ি দেবে। খাটুনী কম খাটাও না বাপু!

আমরাও কি কম খাটি? চললুম,—প্রহ্লাদ ওঠে।

ওদের দুজনেরই মনের মেঘ কেটে যায়। কালকের কথা আর কেউই স্পষ্ট করে বলে না। প্রহ্লাদ ওর অন্যায়টা কিছু বোঝে। নীরুও তার অন্যায়টা কিছু বোঝে। তবু যাবার আগে নীরু ওকে আস্তে করে বলে,—রাগ কোর না যেন। আমার ত' স্বামী নেই, অমন অবুঝের মত কাজ করলে পাঁচজনের মুখ বন্ধ করবে কি দিয়ে। আর কখনও অমন কোর না।

প্রহ্লাদ বলতে চায় অনেক কিছু; কিন্তু কিছুই বলে না। মিছামিছি কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি? নীরু কি কিছু বোঝে না, সব বোঝে। সব বুঝেই যদি এমন কথা বলে, তবে তাই হোক।

চলে যায় প্রহ্লাদ।

১৬

শনিবার সকালে। প্রায় দিন দশেক পরের শনিবার। প্রহ্লাদকে যেতে হয় একবার কানাইয়ের কাছে। কানাই বলেছিল একটি বাহারী সাড়ী বুনতে রতনমনির জন্যে। প্রহ্লাদ সাড়ীটি বুনেছে। কানাইয়ের কাছে সাড়ী নিয়ে যায়। কানাই কিন্তু রতনমনির নাম বলে না প্রহ্লাদের কাছে,—দাম পরে পাবি।

কবে?—বলে প্রহ্লাদ।

এ্যাই ধরনা হপ্তাখানেক পরে।

অত দেরী হলে চলবে না।—প্রহ্লাদ চোখ কোঁচকায় বিরক্ত হয়ে।

কানাই ভয় পায়। প্রহ্লাদের সঙ্গে এমনিতেই ওর কথা বলতে ভয় করে, তার ওপর আবার সাড়ীর দাম নিয়ে কথা কাটাকাটি হলে পর হাড় কখানা আর আস্ত রাখবে না।

প্রহ্লাদকে আবার কানাইয়ের চেয়ে ভয় করে বেশী থাকোমণি। কানাইয়ের পায়ের গোছা টাঙিতে উড়িয়ে দেবার পরে থেকে থাকোমণি প্রহ্লাদকে দেখলেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

আজও প্রহ্লাদ এসেছে শুনে থাকোমণি বেড়ার পাশে ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।· ·

প্রহ্লাদের চোখ কোঁচকান দেখে ফ্যাকাসে মুখে তবু হাসতে হাসতে বললে কানাই,—তোর দাম আমি ত' চুরী কোরব না ভাই।

থাকোমণি কিন্তু বেড়ার পাশে থেকে চুড়ির শব্দ করতে করতে গলার শব্দ করতে লাগল সজোরে। কানাই শুনেও শোনে না দেখে প্রহ্লাদই বললে,—তোমাকে বোধহয় ডাকছে ভেতরে।

কে ডাকছে ?—জেনেও না জানবার ভান করে একটু ভেতরের দিকে যায় কানাই। থাকোমণি প্রহ্লাদকে প্রায় শুনিয়ে শুনিয়েই বলে,—টাকা আমি দিয়ে দোব খ'ন, কাল যেন আসে।

কানাইয়ের আর কিছু বলবার দরকার হয়না। প্রহ্লাদ বলে,—আচ্ছা তাই কাল কথা রইল।

সাড়ী নিয়ে দুপুরে কানাই যায় রতনমনির কাছে। রতনমনি সাড়ী দেখে খুব খুসী। টাকা দিয়ে দেয় কানাইকে। কানাই টাকা ট্যাঁকে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলে,—যেমন চাইবেন হুজুর। যখন যা চাইবেন। কেনোকে শুধু একবার একটু জানালেই,—ব্যস।

রতন হাসে। লেখায় মনোনিবেশ করে। একটি ছড়া লিখছিল রতন।

'দৈনিকদর্পণ' নামে খবরের কাগজখানা ছিল সামনে। তারওপর একটি কাগজ রেখে ছড়া লিখছিল বতনমনি। নীরস কুঠির কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশী বাজান, ছড়া লেখা, গুনগুন্ করে গান গাওয়া এ যেন না হলে ওর চলে না। মনের কোথায় যেন ভাবগুলো জমে চাপ ধরে থাকে। সেগুলো ছড়া স্থরে গানে বেরোলে নিশ্চিন্তি। অদ্ভুত মনের গঠন রতনের।

দিন যায়, সন্ধ্যা যায়। রাত হয়ে আসে। বাঁশীটি কোমরে গুঁজে সাড়ীখানা হাতে নিয়ে বেরোয় রতন। চুলগুলো ফাল্গুনী সন্ধ্যার বাতাসে উড়তে থাকে। কাপড়ের কোঁচাটা কোমরে। চতুর্থীর চাঁদের আলোয় পরিষ্কার পথঘাটে বতম চলে। সড়ক বেয়ে অনেকটা এসে জমীদার বাড়ীর কাছে একবার দাঁড়ায়। বিরাট প্রাসাদ। স্তব্ধ হতবাক পরাজিত রথীর মত দাঁড়িয়ে আছে। বাঈজীর কণ্ঠস্বর আর ভেসে আসে না বাতাসে জলসাঘর থেকে। জমীদার চন্দ্রকান্ত রাত্রে কি করে কেউ জানে না। অনেকে বলে নাকি সমস্ত রাত মদ খায় আর বই পড়ে। সহর থেকে বহু দামী দামী বই আনিয়েছে চন্দ্রকান্ত।

একবার গেলে হয় চন্দ্রকান্তের কাছে। না থাক। ওদিকে আবার দেরী হয়ে যাবে। আজ শনিবার।

আরও অনেক ঝোঁপ, পথঘাটে পেরিয়ে আসতে হয় রতনকে! জনমানব নেই কোথাও। তবু একটু ভয় হয় না রতনের। কেমন একটা আরাম আর আনন্দের আমেজ এসেছে এর সমস্ত দেহ মনে। খুব হাল্কা লাগে সবকিছু। জীবনটাও।

ওই দেখা যায়, পণ্ডিতের বাড়ী। অন্ধকার। আলো নেই ত'? কাছাকাছি এসে বাইরের ঘরের দিকে তাকায় রতন। বাইরের ঘর ভেজান। ছোট মাঠটায় বসে রতন। কোমর থেকে বাঁশীটা বার করে ফুঁ দেয়। সুর বসন্ত বাহার। রতন সুরের তরংগে ভাসতে থাকে। ফাল্গুণী চতুর্থীর গভীর রাত্রে বাতাসে মাঠে বনে আলাপে কিসের যে রঙ লাগে কে জানে। রতন ভুলে যায়। সব ভুলে যায়। ভুলে যায় দেখতে যে চন্দ্রা বাইরের ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বাঁশীর ফুঁ শোনবার পর থেকেই। বসন্ত বাহারে বুক কাঁপায়। মনের স্তরে স্তরে ওর আনন্দের ঢেউ কাঁপে। একমনে বাঁশী বাজায় রতন।

বাঁশী থামে। রতনমনি চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। চন্দ্রা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে আসে সেই ছোট্ট মাঠে। রতনমনি তাকায়। সাদা আলোয় চন্দ্রার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় আজ। পরিষ্কার ছোট্ট কপালের নীচে চকচকে দুটি চোখ। চোখ কথা বলে।

রতন ওঠে।

চন্দ্রা সামনে এগোয়। দুজনে যায় বাইরের ঘরে। অন্ধকারে বসে থাকে দুজন খালি তক্তপোষটার ওপর। চুপচাপ। কেউ কথা বলতে পারে না প্রথমে। হয়ত বা চায়ও না।

কিছুক্ষণ পর সাড়ীর পুটলীটা চন্দ্রার হাতে দেয় রতন,—নাও।

কি এটা?

খোলে পুটলীটি। সাড়ী। আবছা আলোয় বোঝা যায় সাড়ীর রঙ কিছু কিছু।

এটা থাক।

কেন ?

যদি কেউ শুধোয়, কি বলব ?

বলবে আমি দিয়েছি। পণ্ডিতমশাই শুধোলেও বলবে। যদি বলে কবে, বলবে মনে নেই।—একটু হাসে রতন।

চন্দ্রা উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ।

ওখানে কেমন লাগছে ?

কোথায় ?

কুঠিতে।

ভালই।—উত্তরে একটু উদসীনতা ছিল রতনের।

একটা কথা বলব ?—হাসে চন্দ্রা।

কি ?

বলো সত্যি বলবে !—খিলখিল করে হাসে চন্দ্রা। মুখে আঁচল গোঁজে, পাছে শব্দ হয়। ওটা হাসি না কান্না ঠিক বুঝে উঠতে পারে না রতন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বলো সত্যি বলবে ?

বলবো।

আচ্ছা,—তুমি মনে মনে আমাকে খুব ঘেন্না করো ?

অবাক রতন,—কেন ?

একটু ইতস্তত করে বলে চন্দ্রা, তেমনি হাসি নিয়ে,—এই ধরো, আমি অসতী।

তুমি ত' অসতীর কাজ কিছু করোনি।

কিছু না ?

কিছু না।

তবে আজ এ অবস্থায় তোমার কাছে এসেছি কেন ?

ভাল লাগে বলে।—

কথাটা বড় নোতুন লাগে চন্দ্রার কাছে। বেশ ত'! ভাল লাগে বলে

এসেছি। সত্যিই ত' তাই। এতে কি কিছু অন্যায় থাকতে পারে? বড় সুন্দর কথা ত'? কিন্তু তবু।

ভাল লাগলেই যে একটা কিছু করে বস্‌তে হবে এটা কি ঠিক?

কেন ঠিক নয়?

তোমাকে আজ আমার যদি মারতে ভাল লাগে, সেটাও কি ঠিক হবে।

ঠিক হবে তোমার পক্ষে। যদি সত্যিই তোমার ভাল লাগে। তাছাড়া মারতে ইচ্ছে করাটা ভাল লাগা নয় খারাপ লাগা। তোমার যদি কোন কারণে খারাপ লাগে কাউকে, তবেই তুমি তাকে মারো। আচ্ছা, তুমিই বলো, আমরা কি অন্যায় কাজটা করেছি।

চন্দ্রা উত্তর দেয় না। চুপ করে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবতে থাকে।

অনেক পরে বলে,—থাক ও কথা। কুঠির কাজ তোমার কেমন লাগছে?

ভাল নয়।

আমার তাই মনে হয়েছিলো, ও কাজ তোমার ভাল লাগবে না, না করলেই ত' পারতে?

না করলে আর কি করা যেত বলো?

কেন আর কিছু করবার নেই। শুধু বাঁশীই বাজাতে।

বাঁশী বাজালে পেট ভরত কিনা সেইটেই ত' ভাবনার কথা।

তা খুব ভরত। এমন বাঁশীর দাম কি কেউ দিত না বলতে চাও?

—তুমি হয়ত দিতে। কিন্তু সংসারে সবাই ত' তোমার মত নয়?—

চন্দ্রা হাসে।

রতন একটু থেমে আবার বলে,—তা ছাড়া তুমিই কি খুব ভাল আছ?

চন্দ্রা মৌন।

চাঁদ ক্রমশঃ হেলে পড়ছে পশ্চিমের বাঁশবনের ওপরে। আলো এসে পড়ছে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর। পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রা। আজকের মত রাত জীবনে বেশী কি আর আসবে?

রতন এবার ওঠে,—চললুম।

—না, আর একটু বাঁশী বাজাও।

—বেশ তুমি ঘুমোওগে যাও। আমি মাঠে বসে বাঁশী বাজাই।

—না, ঘুম পাচ্ছে না।

—বেশ জেগে শুয়ে থাকো যাও। পণ্ডিত উঠে পড়তে পারে!

চন্দ্রা আর আপত্তি না করে শোবার ঘরের দিকে যায়। রতন বাইরে সেই ছোট মাঠটিতে বসে আবার বাঁশীতে ফুঁ দেয়।

সাড়ীর পুটলীটি বালিশের তলায় রেখে চন্দ্রা পণ্ডিতের ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেয়।

১৭

মাস ছয়েক আনন্দেই কাটে। মাকুর শব্দে আর সাড়ী কাপড়ের বাহারে একরামপুর জমজমাট হয়ে ওঠে আবার। প্রাণভরে কাপড় বুনে চলে তাঁতিরা। ন্যায্য মূল্য আসে হাট থেকে সপ্তাহে দুবার। কুঠির আর জমীদারের ধার ধারে না তারা। গুপীনাথ এবার বটেশ্বরী পূজোয় অনেক খরচ করে বসে একাই। বড় সুখ তার প্রাণে, এত দিনে তাঁতিদের একটা সুরাহা করতে পেরেছে। এ-ও কি কম কথা!

কের্তন, তরজা আর যাত্রা লাগিয়ে দেয় তাঁতিরা মাঝে মাঝেই। খরচ দেয় মনোহর। তরজায় কুঠিকে কলা দেখিয়ে গান রচনা হয়ে যায়। কবিগানের ভেতর স্পুণারের চতুর্দশ পুরুষকে উৎসর্গ করে রতনেকে ছুঁচো বানিয়ে ভারী আমোদ পায় ওরা। রতনবাবুকে একদিন নেমতন্ন করে তরজার লড়াইয়ে আনলে হয়। তা কি আসবে?

গদাই আর মাধাই আবার পাশা দাবায় বসে। এবার নিজেদের বাড়ী। কানাইয়ের বাড়ী নয়। কানাই শালা কুঠির নিমক খাচ্ছে। ধরে একদিন দিলে

হয় ঘা' কতক। কিন্তু গুপীনাথের হুকুম। কুঠির কাউকে কিছু বলতে পারে না। ওরা যা করছে করুক। আমরা যা করবার কোরব।

সবই কানে যায় স্পুণারের। স্পুণার কটা গোঁপের ফাঁকে পাইপটা লাগিয়ে কলকাতা বন্দরের ফাইলটা খুলে বসে। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে শিপ্‌মেণ্ট আসতে এত দেরী হবার কি কারণ? হুইস্কির বোতল শেষ হয় যে এক রাত্রে।

চন্দ্রকান্তর দৃষ্টি গভীর হয়ে উঠেছে সব শুনে। সে হাসে না, কিছু বলেও না। শুধু ভাবে যে বোকা মানুষগুলো কত সরল। বোঝে না মাকড়সার জাল থেকে এ পাশে বেরোলে ওপাশে আটকা পড়তে হবে। পর বিষাক্ত আঠা থেকে নিস্তার নেই। বেদনায় চন্দ্রকান্তের মুখ নীল হয়ে যায় দিন দিন। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

সবই হয় তবু গুপীনাথের যেন মন ওঠে না। কোথায় যেন একটু অন্ধকার লাগে, যে জায়গাটা ও ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। তবু এই ভেবেই শেষ পর্যন্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে হয় যে এটা হয়ত তার ভয়ের জন্যেই মনে হচ্ছে। হয়ত বা কুঠি থেকে তাদের এলাকাটা বাদ দিয়ে দেয়াই হয়েছে। সায়েবটার চাউনী কিন্তু সেদিন ভাল লাগল না। কেমন যেন মাছ চুরী করে খেকো বেড়ালের মত ধূর্ত চাউনী। দেখা যাক। মাস যায়, দিন যায়। আরও এক পক্ষ কেটে যায়। আরও একপক্ষ।

সেদিন আঁধার ভোরে উঠে তারা যাত্রা করে হাটে। চন্দনডাঙার হাটে। তাদের কাপড় চন্দনডাঙায় বিক্রি হয় বেশী। অন্য কোন হাটে বড় একটা যায় না ওরা। ভোর থেকে ঘোড়ার পিঠে কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে ওরা চলে চন্দনডাঙার হাটের দিকে। ওখানে কিছু বিক্রি করতে হবে বাইরের ব্যাপারীদের। কিছু বা স্থানীয় মানুষদের। বিক্রি ব্যাপারীদের কাছেই বেশী। জন পনেরো চলেছে ওরা। গুপীনাথ, মনোহর, প্রহ্লাদ, মনোহরের দু'ছেলে, ঘুপটি পাড়ার ছেলেরা সব মিলিয়ে জন পনেরোর দল। হাটে পৌঁছোতে পৌঁছোতে রোদ উঠে যায়। ঘোড়ার পিঠ থেকে মোট নামিয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে হয়। রাস্তাটা কম নয়, আবার চিন্তা কি দর আজ পাওয়া যাবে। কে জানে। গুপীনাথ কোমরের সরু

থলে থেকে পয়সা বার করে,—ওরে,—বলে মনোহরের ছোট ছেলেকে,—কিছু গরম জিলিপী, কদমা আরে মুড়ি নে আয়।

তেলে ভাজা জিলিপীর গন্ধে ওদেরও জল আসছিল জিভে। বেঁচে যায় যেন ওরা। বাদামী তেলে গরম ভাজা জিলিপীর গন্ধ নাকে নিতে নিতে কিনতে যায় এক ছুটে হাটের দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

আরও আছে। পাঁপড় ভাজা, আর মটর ডালের ফুলুরী।

পয়সা আছে ঘনা ?

ঘনশ্যাম মনোহরের ছোট ছেলে ছ' আনা পয়সা বার করে দেয় ঘুপ্‌টী পাড়ার রাম পাজী ছেলেটাকে।

এই পয়সা আছে। খুড়ো দিয়েছে।

দে আমায় দে।

ওর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে স' চারআনায় মুড়ি আর জিলিপী সওদা করে ওই ছেলেটা।

আর সাত পয়সার ভেতর পাঁচ পয়সা কদমা আর দু পয়সা ফুলুরী কেনে। ওকে গোটা দুয়েক ফুলুরী দিয়ে বলে,—নে গলায় পুরে দে।

কিন্তু ফুলুরী গলায় পুরলেই ত' গেলা যায় না। শক্ত ডালের ডেলা। জল চাই। হাটে আবার জল পাবে কোথা ?

ওই অমনি খেয়ে নে না।—বলে ছেলেটা,—থুতু দিয়ে গিলে ফেল।

গলায় পুরেই ফুলুরীর ডেলা আটকে ঘনশ্যামের চোখমুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ছেলেটা ওর গলায় খপ করে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বার করে ফুলুরীর ডেলা। তারপর ওই লালা মাখান হাতেই ওর মাথায় একটা চাঁটি বসিয়ে বলে,—শালা একবারে ভোঁদা !

ঘনশ্যাম ঢোঁক গিলে চাঁটিটা হজম করে যায়,—আচ্ছা সে-ও দেখাচ্ছে। কদমা জিলিপী মুড়ি নিয়ে ওরা পৌছায়। ভাগ হয় মুড়ি জিলিপী।

সবাই খায়।

ঘনশ্যাম গুপীনাথের কানে কানে কি একটা বলে।

গুপীনাথ সেই ছেলেটাকে ডাকে—তু পয়সা চুরী করে ফুলুরী খেইচিস্ ?

মাইরী বলছি ! মা কালীর— ।

চোপ্ ! ধমক দেয় গুপীনাথ ।

প্রহ্লাদ হাসতে হাসতে এসে ওর পিঠে একটি কীল বসায়। ওরে বাবারে—বলতে বলতে পিঠ বেঁকিয়ে শুয়ে পড়ে ছেলেটা। কিন্তু ধনুকের মত উঠেই প্রহ্লাদের পায়ে মারে একখানা শক্ত মাটির ঢেলা।

প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওকে ধরে আনে।

গুপীনাথ বলে ওঠে,—ওরে আর মারিসনি ওকে। ছোঁড়াটাব মা নেই।

মারব না।—বলে প্রহ্লাদ ওকে এনে কোলে বসায়,—এই ত' চাই! যে মারবে তাকে উলটো বসাবি, তবে ত' মরদ।

ছেলেটা চোক মোছে।

প্রহ্লাদ ওকে শুধোয়,—কোথা থাকিস ?

ঘুপ্‌টি পাড়া।

আমার বাড়ী আসবি লাঠি খেলা শেখাব।

ছেলেটা ঘাড় নাড়ে।

দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে চলে। ব্যাপারীরা তু' একজন করে আসতে থাকে। সুধন্য হালুইকরের ঘরে রসগোল্লার গন্ধ আসে। আর এই দোকান থেকেই গোলমাল আসে বিচারের। হাটের সরকার সুধন্যর দোকানে একটি বেত নিয়ে বসে বিচার চালাচ্ছেন। লোকটি বামুন। বেতের মতই রোগা। বিচার করছে। ধরা পড়েছে একটা চোর। সরকার কপালের শিরা ফুলিয়ে যতটা সম্ভব চীৎকার করে বলে জমীদারের বরকন্দাজকে,—লাগাও শালাকে পঁচিশ খড়ম।

বরকন্দাজ খড়ম পেটা করতে থাকে লোকটাকে।

ছেলেরা রসগোল্লার গন্ধও পায় খড়ম পেটাও দেখতে থাকে। ভারী মজা!

বেলা যত বাড়ে—লোকে লোকারণ্য হতে থাকে প্রায় আধমাইল লম্বা বিরাট হাটটি।

গরু ঘোড়া পাঁঠা থেকে বোতল ঝিনুক। আবার স্বৈরিনীর দল এদিকে

ওদিকে। ভট্চায্যি বামুনের ভীড় পূজোর জিনিষের দোকানে। কিলবিল করছে যেন কালো কালো মাথা। বেচাকেনা স্থরু হয়েছে এতক্ষণে। গুপীনাথদের সঙ্গে দর কষাকষি হতে থাকে ব্যাপারীদের।

সূর্য তখন মধ্য আকাশে। অকস্মাৎ ঘোড়ার সারি দেখা যায় আর দেখা যায় অনেকগুলো নতুন মানুষ কাপড়ের হাটে। এসে এরা পৌছল কোথা থেকে? তাকায় তাঁতিরা ব্যাপারীরা। লোকগুলো মোট নামায় ঘোড়ার পিঠে থেকে। পিছনে তাদের দেখা যায় কুঠির সিপাই। বন্দুক হাতে কুঠির সিপাই হাটে! অবাক মানুষের ভীড় জমে যায় চারপাশে।

একটি গাঁইট খোলা হয়। চটের বাঁধের ভেতর থেকে ঝলমল করে ওঠে কাপড়ের ভাঁজগুলো স্থতীব্র রৌদ্রের ঝাঁজে। চোখে জ্বালা ধরে যেন। এত ঝক্‌মকে এমন ঠাস বুনুনী কাপড়। কোথাকার তাঁতি এরা? কি রঙের বাহার আর পাতলা জমীন। তুলে ধরলে ঝলমল করে দোলে। নরম তুলোর মত, সরু স্থতোর পাড়। এত সরু স্থতো কাটে কারা এমন কাটুনী? একরামপুরের সেরা কাটুনী নীরজাবালার আস্‌লা স্থতোও ত' এত' সরেস হয় না!

বিনামেঘে রামধনু দেখে যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে একরামপুরের তাঁতিরা। হাটের ব্যাপারীরা ভীড় করেছে,—কোথাকার কাপড়? কোথাকার তাঁতি তোমরা?

সদর থেকে আসছি। পরীর দেশের কাপড় নিয়ে এইচি! লুট হয়ে গেল। শিগ্‌গির নিয়ে নাও। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এসেছে এ বাহারী কাপড় পরীর দেশ থেকে জলের দাম।

জলের দামই বটে! হায় হায়! সূর্য কি পশ্চিমে উদয় হোল আজ! গুপীনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে কে আনলে এই পরীর দেশের কাপড়! তাদের কাপড়ের চেয়ে অর্ধেক কম দাম, কিন্তু জমীন্ আর রঙ দেখলে মনে হয় বেশী দাম হলেও বোধ হয় বিক্রি হয়ে যেত এ কাপড়। ব্যাপারীদের ভীড় লেগে গেছে। সত্যিই যেন লুঠ হয়ে যাচ্ছে গাঁটের পর গাঁট বিনা চেষ্টায়। হাটে যেন সরগোল পড়ে গেছে।

অসহ্য গরমে রৌদ্রে আর আকস্মিক হতাশায় তাঁতিরা বসে পড়েছে মাথায় হাত দিয়ে। হাটের সরকারের কাছে একবার গেল গুপীনাথ। জেনে এল এরা হাটের ইজারা দিচ্ছে অনেক বেশী। কাজেই এদের আইন অনুযায়ী বলবার কিছু নেই।

ভর দিন চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ঘণ্টাকয়েকের ভেতর ব্যাপারীদের কাছে কয়েকশ' গাঁট কাপড় বিক্রি করে চলে গেল লোকগুলো আর সঙ্গে সেই কুঠির সিপাই কটা। একখানা কাপড় কিনিয়ে রেখেছিল গুপীনাথ দেখবে বলে কি রকম তাঁতে কি রকম সুতোয় বোনা এ কাপড়। সেই কাপড়খানা বগলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সব মাল চাপিয়ে আবার তারা ফিরে চলল ঘর মুখো। গুপীনাথ প্রহ্লাদকে আর মনোহরকে থাকতে বললো শুধু। আর সবাই চলে গেল। প্রহ্লাদ একবার বললে কালো মুখে চোখ দুটো রাঙা করে,—একবার বললে না কেন, শালাদের মাথাকটা দু'ফাঁক করে দিতুম।

সিপাই ছেল যে!

দুত্তোর সিপাই। আমার লাঠির সামনে পড়লে তোমার সিপায়ের হাত থেকে বন্দুক পড়ে যেত।

চল না আমার সঙ্গে। হুজুরের কাছে যাব এখুনী এর একটা বিহিত করতে।

মনোহর প্রহ্লাদকে নিয়ে চলল গুপীনাথ জমিদার প্রাসাদের দিকে। তখন তখন পশ্চিমের আকাশ রাঙা হয়ে এসেছে ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলোয়। প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। নায়েবকে বললে,—হুজুরের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

দেখা এখন হবে না। যাও এখন।—প্রায় ধমকে বলে অনন্ত ঘোষাল।

প্রহ্লাদ চোখমুখ লাল করে বলে,—দেখা আমাদের করতেই হবে।

হবে না।—কথায় জোর দিয়ে বলে নায়েব।

অকস্মাৎ দেখা যায় ধুতি চাদরে ফুরফুরে বাবু হয়ে আসছে জমীদার বাড়ীর দিকে রতনমনি।

কি হয়েছে?—শুধোয় রতনমনি।

হুজুরের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।—প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে গুপীনাথ।

দেখা করতে ত' চাইবেই!—মুচকী হেসে রতনমনি বলে নায়েবকে,—দাও ওদের ছেড়ে দাও। কোন ক্ষতি নেই।

রতনমনির কথায় অবাক হয় অনন্ত ঘোষাল,—কিন্তু আপনিই ত' হুজুর বলেছিলেন—।

যা বলেছিলাম সে কথার আর দরকার নেই। এসো তোমরা আমার সঙ্গে।

রতনমনির সঙ্গে যায় গুপীনাথ ওরা। রতন সোজা জলসাঘরে যায়। জলসাঘরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে জমীদার চন্দ্রকান্ত। কিছুদিনেই যেন তার মুখখানা শুকিয়ে বুড়োর মত হয়ে এসেছে। নিতান্ত চিন্তিত থাকার দরুণ কপালের বলীরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, রতন ঢুকতেই চন্দ্রকান্ত একটু হেসে অভ্যর্থনা করে।

হুজুর বাঁচান।—বলতে বলতে দরজার সামনে কেঁদে পড়ে গুপীনাথ আর মনোহর। প্রহ্লাদ দাঁড়িয়ে থাকলেও তারও মুখ আজ অস্বাভাবিক ভীতগ্রস্থ।

কে? লাফিয়ে ওঠে চন্দ্রকান্ত,—কে, কি চাই! দরজার কাছে এগিয়ে আসে। এসে দেখে গুপীনাথ,—কি খবর তোমাদের কাঁদছ কেন?

পরীর দেশের কাপড এসেছে হুজুর, আমাদের কাপড় আর কেউ কিনবে না। এই দেখুন হুজুর—বগল থেকে খাস ম্যাঞ্চেস্টারের আমদানী কাপড়খানা বার করে দেয়।

জমীদার চন্দ্রকান্ত অবাক—পরীর দেশের কাপড়!

হ্যাঁ, হুজুর। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এসেছে।

কাপড়খানা বেশ ভাল করে দেখতে দেখতে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায় চন্দ্রকান্তর কাছে। তাকায় একবার রতনমনির দিকে। রতন বাঁকা হেসে বাঁশীটা কোমর থেকে বার করে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকে।

জাহাজের মাল বিলেত থেকে এসে গেছে তা হলে?—অসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠস্বর চন্দ্রকান্তের।

এসেছে।—খুব সহজভাবে মৃদু হেসে উত্তর দেয় রতনমনি তরফদার।

আজ হাটে মাল বেচা হয়েছে?

হয়েছে।

এ লোকগুলো যে না খেয়ে মরবে?

মরবেই ত'।—বাঁশী ঠিক করতে করতে অম্লান বদনে বলে রতনমনি।

কিন্তু আমি ত' মরতে দিতে পারি না। উত্তেজিত কণ্ঠ জমীদার চন্দ্রকান্তর।

না পেরে আর আপনার উপায় কি বলুন।

উপায়। হাটে কাপড় বেচতে দোব না।

একটু হাসে রতন,—কোম্পানীর রাজ্যে বাস করে একথা কি বলা যায় চন্দ্রকান্তবাবু। নবাব ত' নামে মাত্র।

চন্দ্রকান্তর শিরা-উপশিরায় বহু যুগ পূর্বের অভিজাত রক্তের স্রোত বইতে থাকে। তপ্ত কণ্ঠে বলে,—রাজ্য কোম্পানীর নয়, রাজ্য আমার।

অনর্থক উত্তেজিত হবেন না। পারেন যদি কিছু করতে আমিই আপনাকে সাহায্য কোরব। ওসব কথা থাক। একটা পটদীপের আলাপ শুনুন।

বাঁশী ঠোঁটে তোলে রতন।

আর একটা কথা শুধু আমায় সত্যি বলবেন? আপনাকে অনুরোধ করছি। বলে চন্দ্রকান্ত।

বলব।

কাপড়ের গাঁট কি কুঠিতে আরও আছে?

না। সব বেচা হয়ে গেছে। আবার মাল আসবে।

কবে বলতে পারেন?

পরশু।

কখন?

রাত দশটা নাগাদ পৌছাবে সব গরুর গাড়ী সদর থেকে।

অশেষ ধন্যবাদ।—গুপীনাথের দিকে তাকিয়ে বলে চন্দ্রকান্ত,—তোমরা যাও, আমি ব্যবস্থা করব। গুপীনাথ চলে যায় প্রণাম করতে করতে।

বাজান, পটদীপ নয়,—বসন্ত বাহার! আজ বড় আনন্দের দিন।

বসন্ত বাহারের আলাপ ধরে রতন বাঁশীতে। জমীদার ডাকে—খানসামা। দেরাজ থেকে বোতল বার করো।

আবার আজ প্রাণ ভরে মদ খাবে চন্দ্রকান্ত। আজ তার বড় আনন্দের দিন। বোঝাপরার দিন ঘনিয়ে এসেছে। জীবনের শেষ যুদ্ধ। হয় বাঁচা, না একেবারে মরে যাওয়া। হয় প্রাসাদের নোতুন রঙ না হয় প্রাসাদ ধূলিসাৎ!

বাহারের ঘন আলাপ দ্রুত লয়ে চলে তবলার ঠেকার সঙ্গে।

চন্দ্রকান্তর সামনে গ্লাস নিয়ে আসে খানসামা। এক চুমুকে নিঃশেষ করে বলে, —বাঈজীকে ডাকো। এখুনী।

খানসামা সেলাম করে চলে যায় বাঈজীর ঘরের দিকে।

বাহারের সুর দ্রুত হয়ে শেষ হয়ে আসতে থাকে। দেখতে দেখতে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে জমীদার চন্দ্রকান্তর মুখ। রতনমনি আজকে হঠাৎ আবার এই পরিবর্তনে অবাক হয়। তবু বাইরে প্রকাশ পায় না সেটা। বাঈজী এসে পড়ে।—সঙ্গে দুটো ভেড়ুয়া।

রূপোর পানদানী থেকে পান মুখে ফেলে একটা, একটু জর্দা,—কি হুকুম মহারাজ?

নাচ লাগাও আজ। দ্রুন্‌লয়ের নাচ!

বাইজী সেলাম ঠুকে হাসে। নুপুরের গুচ্ছ দুটো ভেড়ুয়ার হাতে দিয়ে বলে,— —লেও, বাঁধো। ভেড়ুয়া পায়ে নুপুর বাঁধতে থাকে। আসে সারেঙ্গী, আসে ঢোলক সেতার।

জম্‌জমিয়ে ওঠে জলসাঘর। রক্তবর্ণ মুখে বসে থাকে চন্দ্রকান্ত, রাঙা চোখে আজ নিদারুণ উত্তেজনা।

নুপুরের আওয়াজ ওঠে।

জমীদার চন্দ্রকান্ত চোখ তোলে, হুইস্কির বোতলটা শেষ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

১৮

বেদনায় পাংশু হয়ে গেছে একরামপুরের প্রাণকেন্দ্র। সেদিন রাত্রে আর বাজে না তাঁতের একখানা অর্কেস্ট্রা। 'ব'গুলো আর ওঠানামা করে না। শুধু নিঝুম অন্ধকারের বুকে নীরব হতবাক মানুষগুলোর দীর্ঘশ্বাস।

পাখীও বোধকরি আজ ডাকতে পারে না ভয়ে ভয়ে একরামপুরের বাঁশ বনে আর কামরাঙা ডালে। এক অস্বাভাবিক দমবন্ধ করা আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে ওঠে সবাই।

নিশ্চিত মরণ। যে কাপড় আজ দেখে এসেছে তারা আর যে দামে তা বিক্রি হচ্ছে, তাতে মৃত্যু তাদের সুনিশ্চিত যদি এর কোন ব্যতিক্রম না হয়। ব্যতিক্রমই বা হবে কোথা থেকে? চন্দনডাঙার বিরাট কুঠির শক্তি রয়েছে এর পিছনে। তবু যদি জমীদার চন্দ্রকান্ত কিছু করতে পারে!

গুপীনাথ অন্ধকার তাঁতঘরে বসে আজ তাঁতের মাটীলেপা বেদীর ওপর মুখ রেখে কাঁদে, গুপীনাথে গোপন চোখের জলে ভিজে ওঠে মসৃণ মাটীর বেদী। তাঁতের রোলাটায় মুখ ঘসতে ঘসতে মনে মনে বিলাপই শুধু করতে পারে গুপীনাথ। আজ প্রথম যেন ওর মনে হয় ওদের হাত পা বাঁধা। নিজেদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাও যেন নেই। কোথাকার এক অদৃশ্য বাঁধনে এতদিন ওদের বেঁধে রেখেছিল জমীদার আজ বাঁধছে রেশম কুঠির কুঠিয়াল। তাদের মর্জির ওপরই যেন ওদের জীবন মৃত্যু,—আর এই ই তাদের বিগত বহু যুগের ইতিহাস।

গুপীনাথ তাই হতাশায় অন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত সেই অদৃশ্য পরম শক্তির কাছেই কাঁদে, ভগবান, না খেয়ে যেন মরতে না হয়।

প্রহ্লাদ নীরবে গিয়ে ওর তাঁতঘরের সামনে বেত ঝোঁপের পাশে গিয়ে বসে থাকে। মনটা উদাস—ক্রোধ প্রকাশের উপায় নেই, তাই অদম্য ক্রোধকে দমন

করতে গিয়ে ওর মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাথা কটা ফাটিয়ে আসতে যদি পারত, তবে আজ শান্তি হোত প্রাণে।

সব ঘটনা শুনে নীরু অস্থির হয়ে ওঠে প্রহ্লাদের জন্যে। খুন জখম করে না বসে আজ ডাকাত মানুষটা। বাড়ীতে যায় প্রহ্লাদের মায়ের কাছে, ওর অসুস্থ মা বলে, প্রহ্লাদ নেই, বোধহয় আসেনি এখনও। আসেনি? তাঁতঘরেও নেই? তবে এত রাত্রে গেল কোথায়? তাঁতঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় জোর দিয়ে ডাকে,—কালো—অ কালো!

রাত বাড়ে, অন্ধকার বাড়ে, স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে অনেক অনেক পরে অকস্মাৎ শোনা যায় প্রহ্লাদের বেসুরো গলার গান। চমকে ওঠে নীরু। গলাটা যেন জড়িয়ে আসছে। তাঁত ঘরের কাছে আসতেই সামনে গিয়ে গন্ধ পেয়ে টের পায় নীরু যে প্রহ্লাদ আজ তাড়ি খেয়েছে প্রচুর। দাঁড়াতে পারছে না ভাল করে।

এই কালো?

কে?—বলতে বলতে নীরুর কাছে এসে দাঁড়ায় প্রহ্লাদ—তুমি, চলো।

প্রকৃতিস্থ হবার প্রাণপণ চেষ্টা করে প্রহ্লাদ নীরুর সামনে। নীরু ওর কাঁধটা ধরে বলে চলো ভেতরে প্রহ্লাদ চেষ্টা করে কিন্তু চলতে পারে না।

এমন কাণ্ড কেন করলে?

সত্যি বলছি নীরু। বড্ড মনে দুঃখু হয়েছে আজ।

কলসী দড়ি ছিল না?

ছিল না, তুই দিবি।—বলে একটু অসংযমের ভাব প্রকাশ করতেই নীরু ধমক দেয়,—অমন করলে মাথা খুঁড়ে মরব।

প্রহ্লাদ আবার সংযত হবার চেষ্টা করে।

ওকে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় নীরু।—

সত্যি বলছি নীরু আমার মনটা বড্ড—।

চুপ করো।

তুই ডেকেছিলি, শুনেছিলুম, আচ্ছা এত ভালবাসিস—

চুপ করবে না আমি চলে যাব,—ধমকায় নীরু।

আচ্ছা আচ্ছা, এই চুপ করছি। কিন্তু তোর জন্যে আমি—।

নীরু ওর মুখ চেপে ধরে হাত দিয়ে। তারপর মাথায় বাতাস করতে থাকে।

কিছুক্ষণের ভেতরই ঘুমিয়ে পড়ে প্রহ্লাদ।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে প্রহ্লাদের মায়ের সাবু দুধ গরম করে রুগ্ন বুড়ীকে খাইয়ে নীরু বাড়ী চলে যায়। দুঃখের দিনেও নীরুর মনটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে প্রহ্লাদের জন্যে একটু কিছু করতে পেরেছে এই ভেবে।

১৯

রাত দশটা বাজতে আর দেরী নেই। জমীদার চন্দ্রকান্ত তিরিশটি বরকন্দাজ পাঠিয়েছে সড়কী, রাম দা, আর বল্লমসমেত চন্দনডাঙার শেষ সীমানায় সড়কের মোড়ে। হুকুম আছে রাত দশটার পর কোন মানুষ কোন গাড়ী ঢুকতে দেবে না চন্দনডাঙার সীমানার ভেতর। যদি জোর করে; মাথা কেটে নিয়ে আসবে। সর্দার মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা কপালে পরে রামদাখানা চুমু খেয়ে জমীদারকে সেলাম জানিয়ে চলে যায়। চন্দ্রকান্ত বসে থাকে অস্থির মন নিয়ে তার খাস কামরায়।

কুঠি থেকেও হুকুম হয়ে গেছে। পনেরো জন সিপাই বন্দুক সমেত পাঠান হয়েছে। কাপড়ের গাঁটের সব গাড়ী কুঠিতে আসতে হবে, কেউ বাধা দিলে গুলি চালাবে। যত খুন জখম হয় হোক্। কোম্পানী সব দায়িত্ব নেবে।

চন্দনডাঙার সীমানায় বড় বড় দুটো আমলকী গাছের তলায় লুকিয়ে বসে আছে তিরিশ জন বরকন্দাজ। সর্দার গাছের ওপর বসে লক্ষ্য করছে কোথাও কিছু দেখা যায় কিনা! কৃষ্ণা চতুর্দশীর সর্বনাশা সন্ধ্যায় বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘ করেছে হয়ত বা। ঘামে ভিজে কালো কালো লম্বা লম্বা মানুষগুলো নিশিথ

রাত্রের প্রহরীর মতই সড়কী আর রামদা কাঁধে নিয়ে অপেক্ষা করছে হুকুমের—সর্দারের।

রাত আরও বাড়ে। কই কোথাও কোন জনমানবের চিহ্নও ত' নেই। সর্দারের সতর্ক দৃষ্টি দৃঢ়তার থেকে মৃদু কোমল হয়ে আসে। একটু হতাশাও যেন দেখা যায়। এখন একটা সুন্দর রক্তাক্ত ঘটনা না ঘটলে যেন বড়ই আক্ষেপের কথা। উত্তরের সড়কের দিকে যতদুর দৃষ্টি যায়, কিছুই ত' চোখে পড়ে না! শুধু অন্ধকার। আলোর চিহ্নমাত্রও নেই। একটা ডালে রামদাখানা কোপ দিয়ে বসিয়ে রেখে বসে থাকে সর্দার। অকস্মাৎ তার চোখ দুটো চক্ চক্ করে জ্বলে ওঠে। ঠোঁটের কাছে হাত নিয়ে আব্বা দেয় মানে যারা নীচে আছে তাদের প্রস্তুত হতে বলে। বহুদুর থেকে এক সার কতকগুলো আলোর বিন্দু দুলতে দুলতে এগোচ্ছে। গভীর অন্ধকার ভেদ করে সে আলো ক্রমশঃ যেন বড় হতে থাকে, সামনে অনেকটা এসে পড়েছে।

সর্দারের গলার চীৎকার শোনা যায়,—রে রে রে রে—রে রে রে রে—!

নীচ থেকে সবাই রে রে রে রে বলে চীৎকার করে ওঠে।

অনেকটা কাছে এসে পড়েছে গাড়ীগুলো। সর্দার নামে, রাম দা' কাঁধে নিয়ে ভীষণ চীৎকার করতে করতে সেই গাড়ীর দিকে এগোয়।

গাড়ীগুলো তখন প্রায় বিশ গজের ভেতর।

শন্—শন্ করে একটা সড়কী গিয়ে একটা গাড়োয়ানের বুক ভেদ করে বসে পড়ে। চীৎকার করে পড়ে যায় লোকটা। ভীষণ সরগোল সুরু হয়।

গ্রামবাসীরা যেন দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে। চন্দনডাঙার সকলের চোখেই আতংক। ডাকাত পড়ল নাকি?

রামদায়ের কোপে ঝপাঝপ্ কয়েকটা গলা দুখানা হয়ে যায়।

চীৎকারে বিজয় ঘোষণা করে সর্দার।

কিন্তু শেষ ত' এইই নয়।

গরুর গাড়ীর পাশ থেকে আওয়াজ আসে,—গুড়ুম! গুড়ুম!

ধরাশায়ী হয়ে পড়ে গোটা দুয়েক বরকন্দাজ। সরল মূর্খ বরকন্দাজরা হতবাক হয়ে যায় যেন। বন্দুক ত' তারা তখনও দেখেনি। কিছু কিছু গল্প শুনেছে মাত্র।

আবার বন্দুকের আওয়াজ।

আরও দুজন বরকন্দাজ পড়ে যায়।

এদের ভেতর থেকে ভীষণ চীৎকার আসে—আতংকের। কিছু বরকন্দাজ প্রাণ ভয়ে পালায়। কিছু প্রাণ দেয় আর কিছু জমীদার বাড়ীতে চলে আসে।

চন্দ্রকান্ত আকণ্ঠ মদ খেয়ে রক্ত চোখে পায়চারী করছিল উন্মত্ত সিংহের মত। বরকন্দাজের মাথা নীচু দেখে চীৎকার করে,—কি হোল, বল ?

সব পালিয়েছে, সাতটা মরেছে আমাদের, ওদের তিনটে, কেউ এগোতে সাহস করছে না।

সব কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।—খেপে যায় যেন চন্দ্রকান্ত।

পাশ থেকে সব দেখে নায়েব অনন্ত ঘোষাল। চন্দ্রকান্ত বন্দুক নিয়ে নিজে বেরোয়। অনন্ত ঘোষালও বেরোয় পিছন পিছন। চন্দ্রকান্ত যায় যেদিক দিয়ে গরুর গাড়ী আসছে সেই দিকে, অনন্ত ঘোষাল যায় কুঠির দিকে দ্রুত পদক্ষেপে—প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে।

কুঠির সামনের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল রতন।

অনন্ত ঘোষালকে দেখে বলে,—কি খবর ?

হুজুর নিজে বেরিয়েছেন। নায়েব কই ?

ঘরে,—রতন একটু চমকে ওঠে। চন্দ্রকান্ত নিজে বেরিয়েছে, এমন বোকার মত বেরোবার কোন অর্থ ই খুঁজে পায় না রতন। সামন্তদের শেষ দম্ভ কতই মূর্খামীর মত হাস্যকর।

স্পুণার পাইপ্ দাঁতে চেপে আস্তে ঘোষালের কথা শোনে, তারপর ভাঙা বাঙলায় হুকুম দেয় দুজন সিপাইকে,—খুন করে লাস নিয়ে চলে এসো।

হুইস্কির বোতল থেকে গ্লাসে ঢালে স্পুণার।

অনন্ত ঘোষাল স্বপ্ন দেখে এবার জমীদারীটা তারই সব হোল !

রতন হুকুম শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বুকের কোথায় কোন একটা জায়গায় ওর বেঁধে। চন্দ্রকান্তর আরক্তিম মুখে ভাসা ভাসা চোখ দুটি মনে পড়ে ওর, আর মনে পড়ে, বলেছিল, জানি রতনবাবু আমাদের দিন ফুরিয়েছে। এখন আপনাদের দিন।

রতন যেন একটু ভাল বেসে ফেলেছিল চন্দ্রকান্তকে। ভাবতে ওর গা শিউরে ওঠে যে একটু পরেই আসবে চন্দ্রকান্তের লাস, পোঁতা হয়ে যাবে কোন এক জায়গায় মাটীর তলায়।

ও স্পুণারের কাছে যায়,—শরীরটে ভাল লাগছে না স্যার, শুইগে একটু আমি।

স্পুণার পাইপ মুখে হাসে,—যাও, ভয় পেয়েছে কাওয়ার্ড!

নিজের ঘরে এসে দরজা জানালা সব বন্ধ করে দেয় রতন। আলোটা ভালো জেলে শুয়ে পড়ে। চন্দ্রকান্ত শেষ দেখে গেল। রতনের কিন্তু এটা দেখাই ছিল। সে জানিত কোম্পানীর সামনে হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়াতে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে, এর চেয়ে মূর্খামী আর কিই বা থাকতে পাবে। চন্দ্রকান্তও বোকা ছিল না। সবই জানত। তবু হয়ত বা জীবন দিয়ে মান বাঁচিয়ে গেল চন্দ্রকান্ত। অপমানের চেয়ে মৃত্যুই ভাল ধারণা ছিল তার। কি নিস্ফল দম্ভ!

একটা জানালার পাট খুলে দেয় রতন। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশটায় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। ঘুম আর আজ আসে না।

একরামপুরের ইতিহাসে তাঁতিরা জবাই হয়ে গেল আজ এই কিছু আগে। শেষ কাঁটা চন্দ্রকান্তের লাস হয়ত বা স্পুণারের বুটের কাছে—লাথি মেরে দেখছে স্পুণার অসমসাহসিক লোকটার মাংসল দেহ।

কেঁপে ওঠে রতন। বাইরে যাবে নাকি একবার?

কিন্তু সে কি ওই দৃশ্য দেখতে পারবে? কেমন একটু ইচ্ছে হচ্ছে যেন দেখতে এক বিভৎষ আনন্দের বশে।

তবু উঠতে পারে না রতন। হাত পা যেন অবশ হয়ে গেছে ওর। শুয়ে ঘামতে ঘামতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

২০

কালো মেঘ জমে এলো যেন একরামপুরের আকাশে। বজ্রাহত হয়ে জ্বলে গেল সব। জমীদার চন্দ্রকান্তর কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি আর। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল মানুষগুলো। জমীদারের কি যে হয়েছে তা আন্দাজ করতে বাকী রইল না করো, তবু মুখে বলতে সাহসই বা কার আছে! দেয়ালের ত' কান আছে, যদি কোন রকমে কথাটা কুঠির কারো কাণে যায়। রেশম কুঠির মাটীর তলায় হয়ত বা তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

তবু অনন্ত ঘোষাল কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে ধরা গলায় বলবার চেষ্টা করলো জমীদার গৃহিণীর কাছে,—শালারাই বাবুকে মেরেচে মা, বলুন ত' শালাদের দেখিয়ে দি একবার মজা!

বলেই আবার বলে,—তা হলে আমারই কি আর মাথা থাকবে মা! সায়েব নয়ত আস্ত বাঘ। কি করি কিছুই ত' ভেবে পাচ্ছিনে।

রোরুদ্যমানা জমীদার গৃহিনীও কুঠির ভয়ে কাঁপছিলো, বললে,—কিই বা করবে যা কপালে ছিল তাই ই হয়েছে। আমাকে একবার সায়েবের কাছে নিয়ে যেতে পারো?

আপনি যাবেন মা ওই ম্লেচ্ছদের কাছে। এ আমি থাকতে হতে পারবে না। ঘোষালের প্রাণ যখন যাবে, তখন যা খুসী করবেন। ও ব্যাটারা কি আপনার মান রাখতে পারবে মা!

অনন্ত ঘোষাল চলে যায়।

জমীদারীটা তার আয়ত্তেই এলো এতদিনে। বহুদিনের স্বপ্ন তার সফল হতে চলেছে।

বিকেলে আর একবার যেতে হবে। সায়েবের কাছে কিছু পুরস্কারের আশা

আছে। কিন্তু রতনবাবু ত' তার সঙ্গে কোন কথাই বললো না কাল। ভদ্রলোক যেন গম্ভীর হয়ে গেছে হঠাৎ। কিছু মতলব আছে কিনা কে জানে! সায়েবের কথায় মনে হয় রতনবাবুর ভাতও ফুরিয়েছে ওখানে। লোকটাকে তাড়িয়ে তার ছেলেকে ওখানে বসাতে হবে। তবে ষোলকলা পূর্ণ হবে!

অনন্ত ঘোষালের ষোলকলা পূরণের উল্টো দিকের পুরো অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে একরামপুরের মানুষগুলোর মনে। মাকু আর চলে না। বেদীর ওপর ধুলো পড়ে যায়। মাটী দিয়ে ল্যাপা হয় না। রাত্রির বাতাসের তরংগে ভেসে আসে না তাঁতের একটানা আওয়াজ। কি হবে আর তাঁত চালিয়ে? হতাশায় আর ভয়ে হাত পা ওদের অবশ হয়ে গেছে। আকবর বাদশার আমল থেকে তারা বসতি করেছিল এখানে। প্রশংসা আর সম্মানে মুখর হয়েছিল এতদিন একরামপুরের বাতাস। আজ অনাহারের সম্মুখীন হয়ে পূর্ব পুরুষদের সে গৌরবের কাহিনী স্মরণ করতেও লজ্জা হয়। ছড়া আর গান বুনতে পারত যারা সাড়ীর-পাড়ে, যাদের নয়ন সুখ রোমাল আর মসলীনের আদর হোত নবাবের হারেমে, তাদের সে গর্ব ধুলোয় মিশে গেল আজ। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে নিয়ে এলো কাপড় পরীর দেশের মানুষ। এতকালের অহংকার খান্ খা হয়ে পড়ল ভেঙে পড়ল তাঁতের বেদী গুঁড়ো হয়ে। দেড়শ ঘর তাঁতির প্রাণে আজ শুধু বেদনা নয়, অনাহারের আতংক।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে গেল। মাস যায়। একখানা কাপড় বিক্রি হোল না চন্দন ডাঙার হাটে। হাটে যেতে যেন লজ্জায় মুখ নীচু হয়ে পড়ে ওদের। চুণ কালী মেখে দিয়েছে যেন কে তাদের মুখে। তাদের চোখের সামনে পরীর দেশের কাপড় বিক্রি হয়ে যায়। সব যেন উড়ে যায় যায়। একজন পাইকার ভুলেও আসে না তাঁতিদের কাছে। তাঁতিরা যেমন কাপড়ের বস্তা এসেছিল, তেমনি নিয়ে যায় বয়ে হাট থেকে বোবা গাধার মত সন্ধ্যার অন্ধকারে নিদারুণ লজ্জায় মুখ লুকোতে লুকোতে।

ঘরে যায় সব। ঘরের কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ঘরের মেয়েরা বস্তা দেখে বোঝে একখানা কাপড়ও বিক্রি হয়নি। তারাও বলতে সাহস করে না

কিছু। রূপোর পঁইচা-খানা খুলে দেয় পরদিন বিক্রি করে চাল আসবে। যার যা পুঁজি ছিল, সবই ত' ফুরিয়ে এলো প্রায়। কংকন আর পাকা সোনার ঝুমকো বিক্রি হয় প্রায় প্রতি ঘর থেকে। অবশেষে ঘটি বাটিও।

বলে মনোহরের মেয়ে টুকু বিয়ের নোতুন গয়না দিতে দিতে গদাইকে,—খুড়ো মশাইকে বোল কিছু যেন ভাবে না, ধম্ম আছে, চন্দ্র স্য্যি এখনও উঠছে।

গদাই গয়না কখানা নিয়ে খুড়োমশাই গুপীনাথকে দেয়। গুপীনাথ তাকাতে পারে না মুখ তুলে গদাইয়ের দিকে। গয়না কখানা নিয়ে মহাজনের বাড়ী তাকে তবু যেতেই হয়,—নইলে ভাত চড়বে না হাঁড়িতে।

অবস্থা মাস তিনেকের ভেতরই শোচনীয় হয়ে এলো সকলের। আর ত' চলে না!

বেলা দুপ্রহর পরে এসে নীরু দেখে প্রহ্লাদ মেঝেতে শুয়ে গড়াচ্ছে। মুখখানা শুকনো, চুলে তেল নেই। ওর বৃদ্ধা অসুস্থা মা পড়ে আছে এক পাশে—আজ মরে কাল মরে—এমনি অবস্থায়।

নীরু সবই জানত, এসেই বলে প্রহ্লাদকে,—নাও, চান করে এসো।

শরীরটে ভাল নেই আজ। চান আর কোরব না।

বেশী বোক না। যাও।

প্রহ্লাদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় ওর দিকে। হতাশার চাউনী। নীরুর বুকটার ভেতর বিঁধে যায় সে দৃষ্টি। বলে,—নাও। রান্না নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকব?

রান্না আবার কিসের?

আমার মাথার। খেতে হবে না। উপোস করে থাকলেই চলবে?—

ঘরে চাল নেই প্রহ্লাদের এ খবর নীরু কোথা থেকে পেলো। অবাক হয় প্রহ্লাদ।

খোলাখুলীই বলে এবার,—চাল পেলি কোথা?

ঠিক দুপুরে অত কথার জবাব করতে পারবো না। ওঠ।

হাত ধরে টান দেয় নীরু—ওঠো।

প্রহ্লাদ ওঠে। ভাতের নামে ওর মুখটা ভিজে ওঠে। দিন দুয়েক ভাত খাওয়া নেই। ধারও পাবার উপায় নেই। চুপ চাপ শুয়ে পড়েছিল দুদিন। নীরুর

কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু ভেবেছিল নীরুরও ত' একই অবস্থা। তাই আবার বলে,—চাল কোথায় পেলি? সুতো তোর কিনছে কে?

কেন, কুঠির লোক এসে কিনছে। সদরে যে ওদের তাঁত বসছে। কোম্পানীর তাঁত!

তাই নাকি? সেখানে তাঁতি পাবে কোথায়?

মাইনে করে নিয়ে যাবে।

সেখানে সুতো দিচ্ছিস কেন?

ক্ষেতি কি, দর ত' তোমাদের সমানই দিচ্ছে।

কাটুনীদের অবস্থা তাঁতিদের চেয়ে ভাল তাহলে! ভাবতে ভাবতে ওঠে প্রহ্লাদ। গামছা কাঁধে ফেলে চলে ঘাটের দিকে। স্নান করে এসে ঘরে ঢুকে দেখে ভাত বাড়া। নীরু সামনে বসে আছে।

নাও, বোস।

প্রহ্লাদের একটু যেন লজ্জা হয়, নীরুর রোজগারের ভাত। খেতে হচ্ছে তাকে, অদৃষ্ট এমন হোল!

তোর ভাত কম পড়ল ত'? না হয় কিছু কমিয়ে দে।

এ ভাত কি আমার? এ ত' তোমারই ভাত, ফের ওরকম কথা বললে উপোস করে মরব বলে রাখলুম।

প্রহ্লাদ বসে, ওর খাওয়ার নমুনা দেখে বুঝতে বাকী থাকে না নীরুর যে ক্ষিদেয় ওর পেট জ্বলে যাচ্ছিল। মনে বেদনা নিয়েই ও বলে খুবই আস্তে,—ভেবেছিলাম বোলব না কখনও, তবু না বোলেও ত' পারি না, না খেয়ে শুয়ে আছো, একবার আমার কাছে যাওনি কেন?

তোর কাছে?

হ্যাঁ, আমার কাছে। কেন খুব পর মনে হয়।

প্রহ্লাদ খেতে খেতে হাসে,—যদি বলি পরই মনে হয়।

তবে আমাকে তেরো বছর উপোস করতে হবে।

কেন?

এ তেরো বছর ত' তুমিই খাইয়েছ আমাকে। সেটা শোধ করতে হলে তেরো বছর উপোস করতে হবে।

আমি খাইয়েছি।—অবাক হয় প্রহ্লাদ।

যখন এলুম এখানে তখন কে আমায়—। বলতে বলতে নীরু ঘর থেকে চলে যায় অকস্মাৎ। বোধ হয় গলাটা ধরে এসেছিল।

কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢোকে হাতে আরও ভাতের একটি থালা নিয়ে। কিছু ভাত ঢেলে দেয় প্রহ্লাদের পাতে।

আহা-হা!—প্রহ্লাদ বারণ করবার অবসর পায় না,—পেট ভরে গেছে যে!

দেখো, আমাকে আর মিছে কথা দয়া করে বোল না।

প্রহ্লাদ কথা বলে না। খাওয়া শেষ করে ওঠে প্রহ্লাদ।

একবার শুধু বলে,—কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলবে?

তেরো বছর।—সঙ্গে সঙ্গে বলে নীরু।

প্রহ্লাদ উঠে যায়।

নীরু যাবার আগে বলে যায়,—সন্ধ্যের পর একবার যেও।

সন্ধ্যের পর প্রহ্লাদ যায়। খেয়ে আসে। দিন পাঁচেক এই ভাবে কাটে। ছ' দিনের দিন প্রহ্লাদের মা মারা যায়। রাত তখন একপ্রহর। হাবু, নীলকেষ্ট, কানাই গদাই আরও অনেকে আসে। পড়শী বউ শাশুড়ীরা আসে। গবা আসে। নীরুও আসে।

প্রহ্লাদ কাঁদে না। দেখে সবাই একটু অবাকই হয়। কেউ কেউ বলে,—মা-টাকে যেমন কষ্ট দিত, ও বুড়ীটা মরেছে না বেঁচেচে।

কেউ বা বলে,—ওকে কাঁদাও। না কাঁদলে কলজেতে কষ্টটা লাগবে বেশী।

নীলকেষ্ট বলে,—মরেচে না প্রহ্লাদ বেঁচেছে। বেঁচে থাকলে এই বাজারে খাওয়ান যে কি হাংগাম্! আমার বউ ছেলেগুলো যদি এমনিধারা মরত।

কানাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না কেউ। তবু কানাই এগিয়ে এসে কথা বলতে চায় সকলের সঙ্গে। সবাই মুখ ভার করে থাকে। অপরাধী কানাই কুঠিতে কাজ করে।

কানাইকে শুধু একটু তোষামোদ করে নীলকেষ্ট,ওর ভেতরই ফিস্ ফিস্ কথা বলে ঠিক করে ফেলে, আগামী কাল সকালে দু' শলা চাল ধার দেবে কানাই।

অমন ত' হামেশাই দিতে হচ্ছে আজকাল।—একটু তাচ্ছিল্য ভরেই বলে কানাই, তারপর একটা হাঁই তুলে বলে,—যেও কাল ভোরে, আমি পাশে থাকতে খেতে পাবে না এ কেমন কথা!

মনে মনে একবার ভাবতেই হয় নীলকেষ্টকে কানাইয়ের প্রাণটা ভাল—হোলই বা কুঠির মানুষ। কুঠির মানুষ কি মানুষ নয়?

তারপর ছেলে বউ কেমন আছে তোমার?

ভাল নয় ভাই।—বলে কানাই,—ছেলেটা দিন দিন রোগা হচ্ছে।

তাই নাকি! ডাইনীর দৃষ্টি পড়েনি ত'?—ভোজরাজের ব্যাটা নীলকেষ্ট একটু খুঁড়িয়ে নেয় তাল পেয়ে,—কিছু ভেবো না। কাল সকালে গিয়ে ঠিক করে দোব সব। ছুঁ ফুঁ আর একটু সরষে লঙ্কা পোড়া আর একটু তোমার গে' জলপড়া। ব্যাস্! ডাইনীর চোখ কানা না হয়েছে ত' নীলকেষ্ট ভোজরাজের ইয়ে নয়!

কানাই রাজী হয়।

মড়া নিয়ে যাওয়া হয়।

রাত ভোর মড়া পুড়তে কেটে যায়। যে যার বাড়ী চলে যায় তারপর। একা একা তাঁত ঘরে বসে থাকে প্রহ্লাদ। বেলা বাড়ে। আরক্তিম সূর্য তেজে ফেটে পড়তে চায় যেন। রুক্ষ মাথায় বসেই থাকে প্রহ্লাদ শূন্য মনে। কি করবে আর কি করবে না- সে হিসাবের আর প্রয়োজনই বা কি? যা ছিল, সেও গেল। এখন কেউই ত' নেই—নিজে ছাড়া।

বেলা বেশী বাড়বার আগেই একটি পাথরের থালায় ফল মিষ্টি নিয়ে আসে নীরু। মেঝেতে রেখে খুব আস্তেই বলে,—আর বেলা বাড়িয়ে কি লাভ?

ফিরে তাকায় প্রহ্লাদ,—না লাভ আর কি?

উঠে এসে বসে যেন এর জন্যে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল।

কোন কথা বলে না প্রহ্লাদ। অনেক কথা বলবার থাকলে কিছুই বলা যায় না বোধকরি তাই নীরুও কিছু বলতে পারে না।

দিন কাটুক এমনি ভাবে। এক পক্ষকাল কেটে যায়।

প্রহ্লাদ বলে,—এখানে আর ভাল লাগে না নীরু। কোথাও চলে যাব ভাবছি।

কোথায় ?—ভয়ে ভয়ে নীরু বলে।

এই কোথাও। তুই ই বল না কোথা যাওয়া যায় ?

অনেকক্ষণ ভেবে বলে নীরু,—আমাকেই যদি বলতে হয়, আজ বলব না, পরে বলব।

প্রহ্লাদ কথা বলে না। হয়ত বা পরে কবে বলবে নীরু সেই দিনের অপেক্ষাই করবে প্রহ্লাদ।

২১

ভাবতেও যেন রতনমনির গা শিউরে ওঠে চন্দ্রকান্ত আজ আর পৃথিবীতে নেই। তার দেহটা হয়ত কুঠির পশ্চিমে ঘন বনের কোন মাটীর তলায় পচে পচে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেদিন থেকেই রতনমনির মনের কোন একটা কেন্দ্রে পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এক অপরূপ অত্যাচারের সাক্ষী শুধু নয়, যন্ত্র হতে হয়েছে তাকেই। এমন জানলে হয়ত বা সে কুঠিতেই আসত না। কোথাকার কোন এক অর্থলোলুপ বনিকের হাতিয়ার হয়েছে সে নিজে ভাবতেও যেন ঘৃণা হয়। কিছুদিন মনে তোলপাড় করে রতনমনির। দৈনিক সমাচারে—খবর পাঠায় সে। হয়ত বা সবাই জানলে কিছু হতে পারবে, কিন্তু কই সংবাদে কিছুই হয় না। বরং কুঠিতে একটু সতর্ক নজর বেড়ে যায় স্পাণারের এ সংবাদ সমাচারে কে পাঠালো জানবার জন্যে।

শুধু এই নয়। রতনমনি কানাইকে দিয়ে খবর পাঠায় গুপীনাথকে কাপড় দেবার জন্যে কুঠির সঙ্গে যেন তারা চুক্তি করতে আর দেরী না করে, দরে যতটা সুবিধে দেবার রতনমনি করে দেবে। অবশ্য এ প্রতিশ্রুতির পেছনে একটু ছোট ইতিহাস আছে এক অন্ধকার রাত্রির।

সে রাত্রে পণ্ডিতের বাড়ীতে যেতে হয়েছিল রতনমনির। চন্দ্রাও এসেছিলো। মনটা ছিল ঠিক কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতের অন্ধকারের মত। আকাশের মত জমেছিল মনে জমাট মেঘ।

তুমিই কি এসব করলে?—আহত কণ্ঠ চন্দ্রার।

কি?

জমীদার বাবুকে গুম্ করলে?

ঠিক আমিই নই, তবু আমারও এতে হাত ছিল।

লোকগুলো যে আজ খেতে পায় না এ-ও কি তোমারই জন্যে?

কারা খেতে পায় না।

দেখতে পাও না। একরামপুরের লোকগুলো যে না খেয়ে মরে গেল! কত তাঁতিই যে ভিক্ষেয় আসে আজকাল। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাত না পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'এ সব তোমার কাজ?

কে বললে তোমাকে?—ফিস্ ফিস্ করে শুধোয় রতনমনি ভয়ে ভয়ে।

বললে তোমাদের পণ্ডিতমশাই। বলে আবার দেমাক করে। আচ্ছা, তোমরা কি পাষাণ?

পাষাণ হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

কিন্তু আমার যে বিশ্বাস হয় না। যে অমন বাঁশী বাজায়, তার মন এত কঠোর।

কাঁপা গলায় বলে রতনমনি,—কঠোর হবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারি কই?

চন্দ্রা বলে হুকুমের স্বরে,—তুমি এ সবে থাকতে পারবে না।

ক্ষতি কি?

তাহলে তুমি আর তোমাদের পণ্ডিতে তফাত কোথায়।

তা বটে।—চুপ করে যায় রতনমনি।

কুঠির কাজ তুমি ছেড়ে দাও।—বলে চন্দ্রা।

রতনমনি বলে,—তারপর কি করবো?

কি আর করবে? এখানে এসে থাকো না!

কাজ নেই। শুধু শুধু এখানে এসে থাকা—এ কেমন কথা!—অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

তাহলে যে তোমায় দেখতে পাবো না।

নাই বা পেলে।—একটু বাঁকা হেসে রতনমনি বলে।

গম্ভীর স্বরে চন্দ্রা বলে,—তাই যদি পারতুম, তাহলে আজও বা তোমার কাছে আসব কেন। তা হয় না।

তবে আমার সঙ্গে তুমিও কোথাও চল না।—বলে ফেলে রতন।

অনেক্ষণ ভেবে চন্দ্রা বলে,—আজ নয়, পরে বলব।

ততদিন অপেক্ষা করেই রইলাম। কুঠিতে আর যতদিন থাকি, কথা দিচ্ছি তোমার তাঁতিদের ভাল করবার চেষ্টাই কোরব। তাতে যদি নোকরীটা যায়ই ত' যাবে।

এরপরই রতনমনি জানিয়েছে কানাইকে দিয়ে গুপীনাথকে যে চুক্তি তাদের আজ না হয় কাল কুঠির সঙ্গে করতেই হবে। এখন চুক্তি করলে হয়ত দর কিছু বেশী পাওয়া যাবে। এরপর তাও যাবে না। গুপীনাথ কিন্তু প্রথমটা রতনমনিকে ভুল বুঝলে। তাহলে হয়ত এর ভেতরেও কোন স্বার্থ আছে অথবা কুঠির কোন ষড়যন্ত্র আছে। তাই রাজী তক্ষুণী হোল না। কিন্তু রাজী না হয়েই বা আর কতদিন থাকা যায়। চোখের সামনে ভিক্ষেয় বেরোচ্ছে—ঘরে ঘরে তাঁতিরা। বিক্রি করছে ঘটি বাটী। ঐ দৃশ্য দেখার চেয়ে যে মৃত্যুও ভাল গুপীনাথের। তাদের দিকে তাকান যায় না। মাকুর দুকোণের লোহায় বুঝি বা এর পর মরচে ধরে যাবে। তাঁতের কাঠে হয়ত বা ঘুন ধরবে আরও কিছু দিন পরে। গুপীনাথ চিন্তায় পড়ে যায়।

একরামপুরের আনাচে কানাচে কথাটা যে রটে যায় যে কুঠিতে কাপড় দিতে পারলে কিছু বেশী দর পাওয়া যেত এ সময়ে। শুনে সকলের প্রাণ যেন কিছু আশার সঞ্চার হয়। একেবারে না খেয়ে মরতে হয়ত হবে না! কিছু দরও পাওয়া যাবে। সবাই গুপীনাথের ঘরে আসে সেদিন। মোড়লকে জানায় সব কথা। গুপীনাথ কিন্তু এখনও কুঠিতে যেতে নারাজ। বলে,—

মান থাকবে এতে তোমাদের? সায়েবের পায়ে ধরে আবার ত' যেতে হোল। মনে নেই বলেছিল সায়েব আবার যেতে হবে আমাদের সেখানে।

সবাই চুপ করে থাকে। দু'একজন বলে,—তা' যা হোক আগে জান, পরে মান। প্রাণে মরতে বসেচি এখন কি মান ধুয়ে পেট ভরবে?

সবাই-ই দেখা যায় কথাটায় যেন সায় দেয়।

গুপীনাথ আবার বোঝায়,—দর যা পাওয়া যাবে, তাতে জাতও যাবে, পেটও ভরবে না।

তবুত' চালের দামটাও পাওয়া যাবে!

বটেই ত'।—বলে সবাই।

প্রহ্লাদ শুধু একটা কথাও বলে না। আগাগোড়া চুপ করে বসে থাকে। সবাই যা বলবে, তাই-ই ত' হবে। ওর নিজের মতামত আর কিছু নেই। হয়ত বা এখানকার ওপর আগেকার সে দরদও নেই আর।

গুপীনাথকে অগত্যা রাজী হতে হয়। পরদিন কানাইকে দিয়েই ওরা খবর পাঠায় যে ওরা কুঠিতে কাপড় দিতে রাজী।

রতনমনি ওদের তিনদিন পর কুঠিতে আসতে জানায়।

এর ভেতরে রতনমনি স্পুণারের কাছে একবার কথাটা পাড়ে,—একরামপুরের তাঁতিরা জানাচ্ছে, তারা কাপড় দিতে চায়।

পাইপ ঠোঁটে কামড়ে বলে স্পুণার,—আর কিছুদিন যাক। তাদের বলো কাপড় এখন নেয়া হবে না।

রতন বলে,—কিন্তু স্যার—।

কি?—তাকায় স্পুণার।

সদর থেকে যা কাপড় আসছে। ততটা হয়ত আর আসবে না। আমাদের এখানে স্টক কম পড়তে পারে।

তাই নাকি? ফাইল নিয়ে এসো।

ফাইলটা নিয়েই এসেছিল রতন। এটুকু চালাকী তাকে করতে হয়েছে।

সদর থেকে মাল যা এসেছে তার চালান কিছু সরিয়ে রেখেছিল। নেহাৎই যদি ধরে ফেলে স্পুণার, বলবে,—মনে ছিল না স্যার!

স্পুণার ফাইল ঘেঁটে বলে,—একটা চিঠি লেখো কোম্পানীকে। কত মাল দিতে পারবে?

চিঠি আমি লিখছি। তাছাড়া খোঁজ নিয়েছিলাম, শুনলাম কোম্পানীর আমদানী মাল কিছু সর্ট পড়তে পারে আগামী মাস দুয়েক।

তবে—।

স্পুণার বলবার আগেই বলে রতন,—তাঁতিদের ডেকে পাঠাই। চুক্তি একটা ওদের সঙ্গে করা যাক। ওরা আবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পায়।

বেশ তুমিই কথা বলো। কিন্তু দরটা আগেকার অর্ধেক কোর।

দেখি স্যার যতটা কমাতে পারি। তবে ভাল মসলীন মলমল কোম্পানী ভারতের বাইরে রপ্তানী করতে চায়। তাদের চাহিদা মেটাবার মত কাজ না করতে পারলে--'

স্পুণার একটু ভেবে বলে,—মিহি চাদর কাপড়ের দরই আগে করবে। ওইটাই আমাদের বেশী চাই।

তাই ত' বলছিলুম স্যার!—হাসে রতন একটু,—একটু বেশী দর হলেও তাতে আমাদের লাভ।

দেখো যতটা কমাতে পার। ঘোষাল বলছিল—।

রতন অনন্ত ঘোষালের নাম শুনে ভ্রূ কোঁচকায়,—কি বলছিল স্যার?

বলছিল আর কিছুদিন পরে তাঁতিরা সবই প্রায় মরতে বসবে, তখন জলের দরে কাপড় পাওয়া যেত।

ঘোষালের কথায় তেমন বিশ্বাস করা যায় না স্যার। ও হয়ত কিছু দালালী চায়। শুনেছি আমি দালালীর আশায় ঘোরাঘুরি করছে ঘোষাল। লোকটা তেমন ভাল নয়।

স্পুণার হাসে,—খারাপ লোকগুলোকেই আমি কাজে লাগাতে চাই হে!

লোকটা অতি খারাপ, নইলে আমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে ত' নিজের মনিবকে মেরে ফেললে! তোমাদের জাতির গৌরব!

টিটকিরী দেয় স্পুণার। নীরবে এই ঠাট্টাটুকু হজম করতে হয় রতনকে; মনে মনে ভাবে সেই ত' লোকটাকে প্রথম টাকা দিয়ে বশ করেছিল। তারা নিজের লজ্জাও কম নয়। এ চরম অপমানের একটা জবাব সে দিয়ে যাবে। ভুল যা হয়েছে তার একটা কিছু প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা সে করবেই।

রতন বেরিয়ে যায়।

তিনদিন পর আবার জমায়েত হয় তাঁতিরা কুঠি কাছে। কিন্তু এবার চোরের মত মাথা নীচু করে। অনাহারে হাত বাড়িয়ে বাঁধন নিতে চলেছে তারা। প্রহ্লাদ আসেনি। না, প্রহ্লাদ আসতে পারে না। জ্বর হয়েছে বলে ঘরে শুয়েছিল। নীরুর কথাতেও সে আজ যায় নি কুঠিতে। মনোহর গুপীনাথই দলের গোড়ায় ছিল। দলটিও এবার খুব বড় নয়। অনেকেই আসতে পারে নি। হয়ত বা এতটা হেঁটে আসবার মত সামর্থও কারো ছিল না। চরম অপমান মাথা পেতে নিতে এসেছে তারা। তবু আসতে হয়েছে। পেটের ক্ষিদেয় আসতে হয়েছে। ইংরাজ বণিকের শেষ আঘাত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তরে বসে স্বপ্ন দেখছে ওয়ারেন হেস্টিংস্। ভারতবর্ষের সমগ্র শিল্প জয়ের স্বপ্ন। রেশম শিল্পের মূল তুলতে আর বেশী বাকী নেই। কুঠির জালে ধরা পড়েছে একটা একটা করে রেশম শিল্পের কেন্দ্র পোকার মত। জাল ছড়াতে হবে। হেস্টিংস্য়ের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে আজ একরামপুরের তাঁত কেন্দ্রে। একরামপুরের তাঁতিদের চিরকালের গৌরব চুরমার হয়ে গেল আজ—খতম হয়ে গেল ভারতের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পের স্বাধীনতা।

দাস খত লিখতে হোল। টিপ্ সই দিতে হোল তিনজন তাঁতিকে। চুক্তি শেষ হোল। রতনমনি চেষ্টা কোরল যতটা পারল, দরের দিকটা দেখতে। তবু তাতে হয়ত বা তাঁতিদের ভাতও জুটবে না। চুক্তি অমান্য করলে কি হবে, সেটা বলবার দরকার ছিল না। তবু ফিস্ ফিস করে বলতে গিয়ে গলা ধরে গেল

রতনের,—ঠিক জানিনে গুপীনাথ, তবে চুক্তি না মানলে ওই জঙ্গলে হয়ত বা তোমাদের পুঁতে ফেলতে পারে—ওইখানেই ত' পুঁতে ফেলা হয়েছে তোমাদের হুজুর চন্দ্রকান্তকে !

কেঁপে ওঠে গুপীনাথ। তালশাঁসের মত সাদা জোলো চোখে রক্ত নেই ওর। শুধু ভবিষ্যতের গভীর হতাশার দৃষ্টি। কাঁপতে কাঁপতেই ওরা ফিরে আসে নিজেদের গ্রামে; কিন্তু চাকরের তমোআচ্ছন্ন মনোভাব নিয়ে। কাল থেকে তাঁত তারা চালাবে কিন্তু সেটা চুক্তির মাল পুরো হিসেবে দেবার তাগিদে। তাঁতের অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গান আর গাইতে পারবে না ওরা মনের খুসীতে। খুসীটুকু আজ বিকিয়ে দিতে হয়েছে, নিয়ে এসেছে দাসখতের চিরকালের জ্বালা।

সবাইকে ডেকে বলে দিলে গুপীনাথ,—কত গাঁট কাপড় দিতে হবে, তার ভেতর কত গাঁট মিহি আর কত গাঁট মাঝারি। সকলের ভেতর ভাগ করে দিলে কাজ। কাজ হিসেবে পাবে মজুরী। মুখ নীচু করে কথাগুলো শুনলো সবাই। মুখ নীচু করেই চলে গেল বলদের মত। কাঁধে যেন জোয়াল পড়েছে। প্রহ্লাদ এলো না। ও আর আসবে না।

গেলে না কেন আজ ?—বলতেও সাহস পায় না। নীরু জানে কেন প্রহ্লাদ যায়নি। ঘরে এসে ওর মাথায় হাত রাখে।

প্রহ্লাদের গাল চোখের জলে ভেসে যায়। আঁচলে মুছে দেয় নীরু।

একটা কথাও তবু বলতে পারে না।

প্রহ্লাদও না।

নীরু আবার আসে,—খাবে চলো।

খিদে নেই।

চলো তবু।

চলো।

প্রহ্লাদের অত বড় বুকভরা প্রাণ যেন আজ কে কেড়ে নিয়েছে। প্রাণ নেই আর।

সেদিন রাত্রিতে আবার একরামপুরে বাতাস দেড়শ তাঁতের শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু কেমন যেন বেসুরো। সুর হারিয়ে গেছে আজ।

রতনের বাঁশীতেও সুর হারিয়ে গেছে আজ। পণ্ডিতের বাড়ীর সামনের মাঠে না গিয়ে আজ আর পারে না রতন। বাঁশীতে ফুঁ দেয় কিন্তু সুর আর তেমন বেরোয় না যেন। রতনের প্রাণের সুর আজ কথা বলে না। মনে মেঘের বাষ্প জমেছে আজ। কেন না রতন জানে যে ইতিহাসের পাতায় আজকের তারিখ লেখা না থাকলেও আজকেই ইতিহাসের এক গভীর পরিবর্তন হোল আর তার মূলে রতন নিজেও আছে। পলাশীর জয় ইতিহাস নয়! কতকগুলো একরামপুর জয়ই ইতিহাসের আসল সত্য, এ সত্য প্রাণে টের পেয়েছে রতনমনি।

রতনমনির বাঁশী আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

বাঁশী থামিয়ে রেখে চুপ করেই বসে থাকে রতন সেই ছোট মাঠে। চন্দ্রা হয়ত দেখেছে ওকে। তবু চন্দ্রা আজ আসে না। রতনও ডাকে না।

প্রাণের বোঝা আর হাল্কা হবার নয়। বোঝা নিয়েই ফিরে যেতে হয় কুঠিতে।

২২

মাসের পর মাস যায়। একরামপুরের বোবা ক্রন্দনের সাক্ষী হয়ে। কাজ হয় যথারীতি, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ নেই তাতে। একরামপুরের বস্ত্রশিল্পের বনিয়াদ পার হয়ে গেছে ম্যাঞ্চেস্টারে ল্যাঙ্কশায়ারে। কঙ্কালের মত পড়ে আছে শুধু একরামপুরের তাঁতিরা। তবু কাজ হয়। কাজ করতে হয়, যেতে হয়, শুতে হয়, কাঁদতে হয়, হাসতে হয়, কালো মুখে, মুখের কালিমা দূর হয় না।

প্রহ্লাদকেও শেষ পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। নীরুর ওপর বসে বসে আর

কতদিনই বা খাওয়া যায়। বলেছিলো প্রহ্লাদ চলে যাবে কোথাও। নীরু যেতে দেয়নি। বলেছে আরও কিছুদিন যাক না, শেষে না হয় যেও।

সেদিন প্রহ্লাদ এসে ওঠে নীরুর ঘরে। বেলা তখন দুপ্রহর পেরিয়ে গেছে।

জানিস, বনমালীরা চলে গেল আজ গাঁ ছেড়ে।

কোথায় ?

বোধহয় সদরে কোম্পানীর কলে কাজ করবে।

কে জুটিয়ে দিলে কাজ ?

ওই কানাই বোধহয়।

নীরুর মুখটা ততটাই শুকিয়ে যায় যতটা উজ্জল হয় প্রহ্লাদের মুখ। বলে,—গাঁ ছেড়ে গিয়ে কি ভাল করেছে ?

খারাপটাই বা কি করেছে। একা বুড়ো মানুষ যা বুনত, তাতে ওর তিন বিধবা মেয়ে আর বউ মা নিয়ে চলত না! এখানে থেকে না খেয়ে মরবে!

না খেয়ে মরাই ভাল ছিল।—একটা নিশ্বাস ফেলে নীরু বলে,—হাজার হোক, এই মাটীর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান, একে ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই ভাল নয়।

প্রহ্লাদের মনঃপুত হয়না কথাটা, একটু চটে,—না তা আর যাবে কেন। এখানে বসে বসে মুখে চুনকালী মেখে না খেয়ে মরবে। একরামপুরে আর কি মায়া আছে বলত নীরু!

নীরুও গলা চড়ায় একটু,—আছে। তুমি কি বুঝবে। পুরুষ মানুষ বুঝবে না। বাপ পিতেমোর ভিটের মায়া তোমাদের না থাকতে পারে আমাদের আছে। তাছাড়া—তাছাড়া ওই যে তালগাছের ওপর বাবুই বাসা বেঁধেছে—ওটা দেখলেও যেন ভাল লাগে। ওই চালতে বনে গেলে আমার ছোটবেলায় তোমার হাতে কীল খাবার কথা মনে হয়। কামরাঙা গাছটা দেখলে আমার ঠাকুমার কাছে শোনা বেম্মদত্তির কথা মনে পড়ে। ওখানে নাকি বহুকাল একটা বেম্মদত্তি ছিল। এমন আর একটা জায়গা তুমি কোথা পাবে শুনি ? এ জায়গা ছেড়ে গেলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে আমার। তুমি কি বুঝবে সে কথা!

প্রহ্লাদ স্তব্ধ হয়ে যায়।

পশ্চিমের কোনে একটা টিপির ওপর সত্যিই ওই বিরাট কামরাঙা গাছটা যে কত সুন্দর তা কি প্রহ্লাদও জানে না। জানে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী কুৎসিত কুঠির সায়েবের বুটের গোঁজা খাওয়া আর দিনরাত তাদের তোষামোদ করে চলা। কুঠিতে যখন কাপড়ের গাঁটগুলো নিয়ে বয়ে দিতে হয়। আর তার বদলে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে ব ড়ী ফিরতে হয়। সিপাইয়ের বন্দুকের কুঁদোর গোঁজা কারো কারো কাঁকালে বিঁধছে শুনতে হয় আর ওই লোচন পণ্ডিতের ধমক খেতে হয়, তখন আর একরামপুরের মায়াও যেন বিষ বলে মনে হয়।

কুঠিতে ত' আর তোকে যেতে হবেনা!—একটা নিশ্বাস চেপে বলে প্রহ্লাদ।

নীরু বোঝে,—তা বটে। কিন্তু মনে করো না কেন যে জমীদার বাড়ীই যাচ্ছ।

জমীদার বাড়ী ওর কাছে সগ্‌গ। জানিস নে ত' সায়েব শালা পিঠে যখন লাথি মারে। অবিশ্যি আমায় মারলে পা মুচড়ে ভেঙে দিতুম। মারলে সেদিন শশীর ছেলেকে। ওর ভাগে কাপড় কম ছিল। তা সায়েবকে বলেছিল, অসুখ করেছে, তাই কাজ হয়নি। সায়েব বলে,—সে কথা আগে জানাও নি কেন? রেগে গিয়ে বলেছিল ছেলেটা—বেশ করেচি। ব্যাস্ ক্যাঁতাক্যাৎ লাথি! রগ্ দুটো ঝন্ ঝন্ করছিল সেদিন ভররাত।

তারপর কি হোল?

রতনবাবু তাড়াতাড়ি এসে ছেলেটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল ধমকাতে ধমকাতে। ও লোকটা বোধহয় একটু বোঝে।

কি বোঝে!—হতবাক নীরু শুধোয় কোনমতে।

বোঝে আমাদের কষ্ট। বোধহয় বোঝে। নইলে বলে কেন, তোদের যা বলবার আমায় বলবি। সায়েবের কাছে যাবিনি। শালার মেজাজ মদের ওপর আছে কিনা। মিছামিছি মার খাবি। মনে মনে বলি, টাঙির একটা কোপে ওর মেজাজ জন্মের মত উড়িয়ে দিতে পারি।

কপালের রগ দুটো ফুলে ওঠে প্রহ্লাদের। মুখখানা বেগুনী হয়ে যায়।

নীরু বলে ভয়ে ভয়ে,—ও কথা থাক, খাওয়া হয়েছে তোমার?

প্রহ্লাদ গম্ভীর স্বরেই বলে,—না, গিয়ে রাঁধব।

থাক্। এর পর গিয়ে আর হাত পোড়াতে হবে না। খেতে বোস। চান করে এসো চট করে। আমি দুখানা ভাজা ভেজে দিই।

রান্নাঘরের দিকে চলে যায় নীরু ভাবতে ভাবতে যে মানুষ কি কখনও কখনও পশু হয়?

সবচেয়ে আনন্দে আছে এর ভেতর লোচন পণ্ডিত। ব্যস্ততার সীমা নেই তার। কুঠিতেই প্রায় দিনরাত থাকে। শুধু খেতে আর ঘুমোতেই বাড়ী আসা।

ওটাও ত' কুঠিতে করলেই ভাল হয়। রতনবাবুকে বলে খাবার শোবার ব্যবস্থা করে নিলেই পারে?—বলে চন্দ্রা।

খুব খানিকটা হেসে নেয় পণ্ডিত,—তা কি পারি না ভেবেছ! খুব পারি! কিন্তু তুমি একা থাকতে পারবে?

একাই ত' আছি।—কঠিন স্বরে বলে চন্দ্রা।

রাত্তিরে? পারবে একা থাকতে?

খুব পারি। পাশে একজন শুয়ে শুয়ে নাক ডাকে মাত্র। তা না ডাকলেও চলবে।

আরে ওই নাকটা ডাকে বলেই ত' চোর ছ্যাচোর আসে না। আচ্ছা বাঘেরও ত' নাক ডাকে নয়, নয়?

তা হবে, কেন?

আমাকে ওরা আজকাল প্রায় বাঘই বলে। আমাকে দেখলেই জড়সড়। যেন বাঘ দেখেছে। খুব জব্দ হয়েছে শালারা। বামুনকে মারতে গিছলে বাবা এখন বোঝ!

কি জব্দ হয়েছে শুনি?

জব্দ! কি শুনতে চাও। এক এক শালাকে ধরে সিপাইঘরে যখন পাঠাই, নাক মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে যায় রদ্দা খেয়ে। দেখতে ত' সব হাড়গিলে। খেতে পায় না। কোন কোনটা আবার ভিমরী খেয়ে পড়ে, চার ঘা লাথি মারি, আর কোঁৎ কোঁৎ করে উঠে পড়ে।

তুমি লাথি মার !—ঘৃণায় চন্দ্রার ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায়।

তা আর মারব না। বামুনের পায়ের লাথি খাচ্ছে, এত ওদের সাত জন্মের ভাগ্যি! শুধু কি লাথি! সিপাইঘরে যাবার আগে পায়ের ওপর পড়ে, বাঁচান পণ্ডিতমশাই। কেন চাঁদু। আমায় যখন পঞ্চায়েৎ করে মারবার ফন্দি করেছিলে, তখন মনে ছিল না? বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোয় বাপ্ বাপ্ বলে চলে যায় সিপাইঘরে।

চন্দ্রা মুখটা নীল হয়ে যায় ঘৃণায়। এ মানুষটার সঙ্গে সে ঘর করে। এর দিকে তাকাতেও যে ঘৃণা হচ্ছে ওর। তবু বলে,—রতনবাবু তখন কি করেন?

ছোটবাবু? সে আর বোল না। ছোটবাবু মারধর দেখতে পারে না। মারধোর দেখলেই বলে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। আর করবে না কখনও। ছোটবাবু না থাকলেই ত' মারের জুত্ হয়।

কেন মার, এমনি।

আবার কি?—হাঁই তোলে পণ্ডিত,—ইচ্ছে হলেই মারতে পারি। তবে ধম্ম ত' আছে, তাই দোষ করলেই মার দিই।

কি দোষ করলে?

ধরো। চুক্তিমত কাপড় না দিতে পারলে। এক সপ্তাহ্ না এলে। কুঠির নামে কিছু বলে বেড়ালে। কাপড় বোনা খারাপ হলে—এই সব আর কি?

চন্দ্রার চোখ দুটো জ্বালা করে,—তুমিই তা হলে মারধোরের কর্তা?

কিসের কর্তা নই! হুঁ! সায়েব ত' লোচন বলতে অজ্ঞান। মারের বেলায় লোচন, কাউকে ধরে আনতে হলে লোচন, কাপড়ের হিসেব দিতে হলে লোচন। এখন ত' ছোটবাবুকে সায়েব দেখতে পারে না দু'চোখে। বিশ্বাসও করে না। সব এই শম্মা!

চন্দ্রা শুধোয়,—ছোটবাবুকে দেখতে পারে না কেন?

কে জানে বোধ হয় কোন গলতি পেয়েছে। তাঁতিগুলোকে দেখলে তোমার কি আনন্দ যে হোত। শালারা সব যেন রোগা হয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। লম্ফঝম্প

সব কোথায় উড়ে গেছে!—খুব খানিকটা হাসে পণ্ডিত। চন্দ্রা স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকে।

ভোর হয়। রাত হয়। আবার ভোর হয়। দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসে প্রানস্পন্দন। নীলকেষ্টর বউটা মারা গেল হাত পা ফুলে। ভোজবাজী দেখিয়ে কিছু পয়সা পেত না ইদানীং নীলকেষ্ট। মাসের পর মাস বউটা ভাত খায়নি। ভাত যা হয়েছে দিয়েছে ছেলেদুটোকে আর নীলকেষ্টকে। নিজে খেয়েছে ফ্যান। বলেনি কাউকে। নীলকেষ্টকেও না। মাসখানেক পরেই হয়ত পা ফুলতে সুরু করল বউটার। শোথ হয়েছে ভাবলে নীলকেষ্ট। বললে,—উপোস দাও সেরে যাবে।

বউটা দিন দুয়েক মুড়ি খেয়ে থাকে। তবু ফুলো কমে না।

একটু হয়ত কমে, আবার ফ্যান খেয়ে আবার বাড়ে।

ফুলতে ফুলতে বুকে জল হয়। বউটা মাঝে মাঝেই বলে,—বুকটা বড় ব্যাথা করে গো?

নীলকেষ্ট কি করবে ভেবে পায় না। তবু ভরসা দিয়ে বলে,—বোধ হয় পূর্ণিমার যো' পড়েছে তাই। আর দিনকত মুড়ি খাও।

মুড়িই বা কোথায়? কথা বলে না বউটা।

একদিন সন্ধ্যায়—বুকের ভেতরটা কেমন করছে—বলতে বলতে বউটা মরে যায়, মরে বেঁচে যায়। নীলকেষ্ট ছেলেদুটোকে ধরে কিছুক্ষণ হতাশ নয়নে বসে থাকে। কিই বা আর করতে পারে ও।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে লোকজন জোগাড় করে এসে বউ-এর সৎকার করে।

দিনকয়েক কাটবার পর হাঁপিয়ে ওঠে নীলকেষ্ট। আর ভাল লাগে না একরামপুরের বাতাস। মনে হয় একটা কথা কানাই বলেছিল, ভোজবাজীর কদর আছে সদরে। দিনে নিদেন পক্ষে টাকা পাঁচসিকেও হতে পারে। সদরে যাওয়াই ভাল। তবু একরামপুরের মাঠের মায়া আরও কয়েকদিন ওকে রাখে বেঁধে। কিন্তু আর উপায় নেই। এখানে পয়সা কেউ দেয় না। চালও না।

অবশেষে এক রাত্রি শেষে—নীলকেষ্ট তল্পি-তল্পা গুটোতে থাকে।

কাল্গো বেড়ালের হাড়, বাঁদরের মাথার কঙ্কাল, কড়ি, বাটি সব গুছিয়ে দুটো পোঁটলায় বেঁধে নেয়। ছেলেদুটোকে দু'হাতে ধরে পোঁটলাটা কাঁধে ফেলে।

ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরের বাইরে আসে, কেউ জানে না। কেউ যেন না জানতে পারে। মানুষ জাগবার আগেই নীলকেষ্টকে যেতেই হবে। আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে একবার তাকায় নীলকেষ্ট। ভোজবাজার ব্যাটা নীলকেষ্টর চোখ দুটো অকস্মাৎ জলে ভরে ওঠে। হাতের উল্টো পিঠে চোখটা মুছে সড়কের পথ ধরে নীলকেষ্ট। ছেলেদুটোকে নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে। চোখের জলে ওর গাল দুটো ভিজে যায় একরামপুরের সীমানার বটপাকুড়ের গোড়াটা পেরোতে পেরোতে।

নীলকেষ্টও গেল। কোথায় গেল কে জানে!—একরামপুরে সবাই ফিস্‌ফিস্ করে বলে ভয়ে ভয়ে। চেঁচিয়ে বলবার সাহস যেন কারো নেই। আতংকের বাতাস সর্বত্র গলা চেপে রেখেছে সকলের।

আবার দিন যায়, মাস যায়। প্রহ্লাদের বাড়ীর দরজায় সেদিন সন্ধ্যায় একটা ছেলেকে দেখা যায়। প্রহ্লাদ বাড়ী ফিরছিল বাইরে থেকে রঙ কিনে। দরজার সামনের ভূতের মত ছেলেটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধোয়,—কাকে চাস্।

ছেলেটা চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে মেঘ ঠাসা। প্রহ্লাদ মৃদু বলে,—ভিজছিস কেন, ভেতরে আয়। ছেলেটা ভিজতে ভিজতে ভেতরে আসে। প্রহ্লাদ গা মোছে গামছায়। ওকেও গামছাটা দেয়।

ছেলেটা কিন্তু গা না মুছে দাঁড়িয়েই থাকে।

কোথা থাকিস ?

ঘুপটি পাড়া।—বলে ছেলেটা।

ঘুপটি পাড়া কার ঘরে ?

রাধাবোষ্টমীর ঘরে।

কি চাস ?

তুমি হাটে একদিন আমায় আসতে বলেছিলে।

হাটে।—মনে পড়ে প্রহ্লাদের হাটের সেই ছেলেটাকে যাকে ও বলেছিল,—আসতে। একটু আদরও করেছিল

কি চাস?

মায়ের অসুখ। আমরা তুদিন ভাত খাইনি।

তা আমি কি কোরব?

চাল দেবে তুটি।—ভয়ে ভয়ে বলে ছেলেটা।

প্রহ্লাদ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর ঘরে চালের হাঁড়া উপুড় করে যা চাল ছিল সব দিয়ে দেয় একটা গামছায় বেঁধে।—নিয়ে যা।

ভয়ে ভয়ে আবার বলে ছেলেটা,—রাগ করলে?

না, না। নিয়ে যা।

গামছাটা কাঁধে তুলে বর্ষার ভেতরই বেরিয়ে যায় ছেলেটা। প্রহ্লাদ শুয়ে পড়ে ভাবতে ভাবতে আর কিছুতেই ভাল লাগছে না এখানে। পালাতে হবে। একরামপুরের এই বিষাক্ত বাতাস যেন বুকের ভেতরটা জ্বলিয়ে দেয়। কে এমন করলে। মনের ওপর ভেসে ওঠে ওর স্পুণারের পাইপ মুখে ছবিটি। উঠে বসে প্রহ্লাদ। ওটাকে শেষ করে দিলেও ত' হয়। দেখা যায় টাঙির একটা কোপে।

ঘরের দেয়ালে ঝোলান ঝকঝকে টাঙিখানা নামিয়ে আনে প্রহ্লাদ। ভাল করে দেখে ধার আছে কিনা। একটা কাঁচা কলা এনে টাঙির মুখে রেখে আস্তে টানে। কাঁচকলাটা তুখানা হয়ে যায়। এমনি করে যদি স্পুণারের গলাটা—উঠে দাঁড়ায় প্রহ্লাদ, টাঙিটা ঘাড়ে নেয়।

কিছুক্ষণ ভেবে আবার বসে। রাত বাড়ে। বাইরে বর্ষায় জল জমে গেছে বোধহয়। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তবু প্রহ্লাদ ঘামতে থাকে।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে প্রহ্লাদ। রাত আরও বাড়ে।

অকস্মাৎ দরজায় ঘা পড়ে জোরে।

কে?—চমকে ওঠে প্রহ্লাদ,—কে?

খুব জোরে জোরে ঘা পড়ে দরজায়,—খোলো—খোলো, গিগ্‌গির।

দরজা খুলে দেয় প্রহ্লাদ। নীরু ঘরে ঢোকে, প্রায় ভিজে গেছে নীরু।

কি হোল তোর। এত রাতে?

গবা এখনও ত' এলোনা।

কেন, এত রাত হোল কোথায় গেল গবা?

কি জানি? সকালে ওকে মেরেছিলুম, গালাগালি করেছিলুম, তা' বললে ও কোথায় চলে যাবে আর থাকবে না। কোথায় নাকি কাজ পাবে বলছিল।

কেঁদে ফেলে নীরু বসতে বসতে।

কাঁদচিস কেন, আসবে কোথায় হয়ত গেছে।

শুনছি কুঠির লোকরা তাদের কারখানার লোক ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে যদি নিয়ে যায়?

নিয়ে যায় ত যাবে!—নির্বিকার উত্তর দেয় প্রহ্লাদ।

নীরু কাঁদে,—কিন্তু আমার যে ওই ভাইটা ছাড়া আর—

গলা বন্ধ হয়ে আসে নীরুর।

প্রহ্লাদ চুপ করে থাকে।

রাত আরও বাড়ে। নীরুর চোখের জল শেষ হবার অপেক্ষা করে প্রহ্লাদ।

এবার ঘরে যা।

নীরু মুখ তুলে তাকায়। টাঙিখানা নজরে পড়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

নীরু শুধোয়,—ওটা মেঝেতে পড়ে কেন?

নীরুর চোখ দুটোয় সন্দেহ জাগে,—বুঝতে বাকি থাকে না, প্রহ্লাদের কোন একটা মতলব আছে।

এত রাতেও ঘুমোওনি কেন?

খুসী।

নীরু ওর পিঠে হাত রাখে। ছেলেমানুষের মত ওর পিঠে হাত বুলোয়।

তুই যা নীরু, আর জ্বালাস নি।

যাব না।

এখানে থাকবি ভর রাত।

থাকব।

ভোরে উঠে মুখ দেখাতে পারবি? বাঁকা হাসে প্রহ্লাদ।

পারব। কেন যে পারব তা তুমি জান না?

বোঝে প্রহ্লাদ। নীরু আজ রাত্রে প্রহ্লাদকে শান্ত করতে চায়। বুঝেছে নীরু যে প্রহ্লাদ আজ রাত্রে একটা কিছু করবে।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে প্রহ্লাদ বলে,—তুইই ত' একদিন রাত্রে তোর ঘরের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি আমায়। আজ আমি যদি তোকে তাড়িয়ে দিই।

আমি যাব না।—নীরু চোখদুটো রাঙা হয়ে জলে ভরে ওঠে আবার।

তবে আমি যাই। আমায় আজ যেতেই হবে,—টাঙিটা হাতে নিয়ে উঠতে যায় প্রহ্লাদ।

নীরু ওর পাদুটো ধরে,—যাও ত' এবার।

ছাড় নীরু, আমায় ছাড়, আমার কাজ আমায় করতে দে।

নীরু ওর পা আঁকড়ে ধরে থাকে। বাইরে প্রবল বর্ষণে আর মেঘের গর্জনে সব কিছু বুঝি ভেসে গেল। প্রহ্লাদের কপালের রগ দুটো রাগে দপ্ দপ্ করে ওঠে। নীচু হয়ে নীরুকে টেনে তোলে, দু-হাতে চেপে ধরে বলে,—পালা শিগ্‌গির।

আমি যাব না।—নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়েছে নীরু প্রহ্লাদের হাতের ভেতর। প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে ওকে ছেড়ে দেয়। টাঙিটা দেয়ালে তুলে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

আরও অনেক পরে নীরু ওঠে। চোখ মোছে। প্রহ্লাদের মাথার কাছে বসে ওর মাথায় হাত বুলোয় ঘুম পাড়াবার জন্যে। প্রহ্লাদ ঘুমিয়ে পড়ে।

নীরু এবার উঠে আসে। টাঙিখানা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দোরটা ভেজিয়ে দেয়।

বর্ষণ ক্লান্ত আকাশে জোনাকীর মত জ্বল জ্বল করছে তারাগুলো। বাতাস বইছে মধুর ঠাণ্ডা! নীরু ভাল করে নিশ্বাস নেয়। ভাল করে তাকায় চারদিকে। জলে কাদায় অতি সন্তর্পণে টাঙিখানা নিয়ে নিজের ঘরে চলে আসে।

সেদিন চন্দনডাঙার হাটে গিয়ে তাঁতিরা আরও একবার অবাক হয়। পাহাড়ের মত স্তূপাকার সব সুতো আমদানী হয়েছে—পরীর দেশ থেকে। মিহি মাঝারি সুতো, নানা রঙের। দাম ? দাম নেই বললেই ভাল হয়। সের তিন চার টাকা। গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে তাঁতিরা। তিন টাকা সের সুতো তারা বাপপিতেমোর আমলে কোন জন্মেও ত' হয়েছিল বলে শোনেনি। পরীরা কি যাদু জানে ? না আলাদিনের প্রদীপ আছে তাদের কাছে, বললেই সুতো এসে যায় ? এতদিন একরামপুরের কাটুনীরা চরকার সুতো টাকায় তিন তোলা আর আস্‌নার সুতো টাকায় দেড় তোলা করে বিকিয়ে এসেছে। খুব সস্তা হলে টাকায় চার তোলা পাওয়া গেছে। তিন টাকা সের! এ যে তাজ্জব কারখানা। পরীর দেশের চরকায় কি মন্তর পড়া আছে। আপনা আপনি ঘুরে যায়, সুতো তৈরী হয়ে যায়।

গুপীনাথরা হাঁ করে শুধু ভাবে কুলকিনারা পায় না কিছু। ওরা কোথা থেকে জানবে যে ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানায় কলে বোনা হয় সুতো। চারকার আর হাতের মেহনতের প্রয়োজন হয় না। ওরা কি করে জানবে যে ওদের হাতের কাজের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে চলেছে ম্যাঞ্চেষ্টারের বিরাট কলকারখানা। লৌহ দানবের সঙ্গে ওদের পারবার জো আছে কি ? মণে মণে তুলো থেকে সুতো তৈরী হচ্ছে দিনে। পাঁচশ একরামপুরের কাটুনী দিনরাত সুতো কাটলেও পারবে না কারখানার নিষ্ঠুর দন্তের সঙ্গে প্রতিদন্দ্বিতা করতে। কালা আদমীদের বাজারে যারা সুতো ছাড়ছে জাহাজ জাহাজ। তাদের বিদ্যুত গতিকে যাদু বলে ভুল করে বসা আশ্চর্য নয়।

সস্তা দামে ভাল সুতো বিক্রি হয়ে যায় হু হু করে। কাটুনীদের সুতো স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সামনে পড়ে থাকে স্তূপাকার হয়ে। একটুও বিক্রি হয় না।

এবার বজ্রের মত আঘাত হানে একরামপুরের মনোকেন্দ্রে ইংরাজ বণিকের বাহাদুরী। মুচকী মুচকী হাসে স্পুণার। এবার শেষ আঘাত। হয়ে পড়বে বাংলার বস্ত্রশিল্পের বনিয়াদ। পড়লোও তাই।

সব শুনে অবশ হয়ে গেল একরামপুরের কাটুনীরা যাদের কোন উপায় নেই ভাত পাবার এমনি সব বৃদ্ধা বিধবা বয়স্থা যুবতীরা কাটত স্থতো দুমুঠো ভাতের জোগাড় করতে। স্বামী নেই, পুত্র নেই, খেতে দেবার কেউ নেই তিনকুলে এমনি সব মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিজেরা স্থতো কেটে। এবার আঘাত পড়ল এদের ওপর। বড়ই মর্মান্তিক আঘাত। এ যেন কতকগুলো অসহায় মুক মূঢ় নারী গোষ্ঠির মুখের ভাত কেড়ে নেয়া হোল জন্মের মত। বলা হোল তাদের এবার তোমরা মরো।

রতনমনির বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। বুড়ীগুলো মরবে। বয়স্থাগুলো ঝি হবে। আর মেয়েগুলোর যে কি হবে ঈশ্বর জানেন। হয়ত বা স্পুণারের শয্যাসঙ্গিনী হয়েই বাঁচবার পথ খুঁজবে। এর চেয়ে একদিনে মেয়েগুলোকে ধরে জবাই করাও যেন ভাল ছিল। রতনমনি কুঠির ঘরের কোনে বসে চরম অস্বস্তি অনুভব করে।

প্রহ্লাদ বলতেও পারে না ভাল করে নীরুকে। শুধু কিছু স্থতোর নমুনা এগিয়ে দেয় নীরুর সামনে,—অবাক কাণ্ড। এই ছাখ। তিনটাকা সেরের স্থতো।

এমন পরিষ্কার সমান স্থতো চরকার কাটা কি করেই বা সম্ভব! কোথায় এতটুকু ওঠা নামা নেই। এতটুকু খিঁচ নেই। নীরু স্থতো পরীক্ষা করতে করতে বসে পড়ে।

এক গেলাস জল দাও ত' কালো!

প্রহ্লাদ এক গ্লাস জল দেয় নীরুকে। সমস্ত জলটা এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলে নীরু।

হতাশ চোখে তাকায়,—এখন আমি কি করবো?

কি আবার করবি।—জবাব ঠিকমত প্রহ্লাদও দিতে পারে না। সত্যিই নীরু এখন কিই বা করবে। তিন টাকা সের স্থতো হাতে কেটে বিক্রি করা অসম্ভব।

দিনে চার পাঁচ তোলার বেশী স্থতো কাটা যায় না। তাও চার পাঁচ তোলা স্থতো কাটতে একমাত্র নীরুই পারে পাঁচ তোলা স্থতো তিন টাকা সের হিসেবে বিক্রি করে ভাত জোটান হাসির কথা।

তবু প্রহ্লাদ বলে,—তোর স্থতো সব আমিই কিনব। ভয় কি ?

নীরুর এ কথাটা বোঝবার মত বয়েস হয়েছে,—তাহলে কি না খেয়ে মরতে হবে ?

আমি থাকতেও তুই মরবি ?—সাহস দেবার চেষ্টা করে প্রহ্লাদ।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে নীরু। এর চেয়ে মৃত্যু হলেই ভাল ছিল। পরের গলগ্রহ হতে হবেনা ত'। এ বয়সে জমীদার বা কোন ধনী ব্যাপারী বা জোতদারের বাড়ী দাসী হওয়াও যাবে না। সেখানে দাসী হওয়ার অর্থ যে কি সেটা সেখানকার বাবুরাও যেমন বোঝে, দাসীরাও তেমনি বোঝে।

একমাত্র পথ খোলা আছে মরতে পারার। শেষে মরতেই হবে। নীরুর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। মাথায় হাত দিয়ে মুখ নীচু করে বসে থাকে।

পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন জন কাটুনী আছে একরামপুরে। সকলেরই ত' একই দশা।

সব চেয়ে ধাঁধাঁর মত মনে হয়, এই স্থতো এত অল্প দামে কি করে দেয় ! তবে কি লোকসান করে দিচ্ছে ওরা। তা যদি দেয় তবে হয়ত পরে দর চড়াতেও পারে।

তবু কতদিনে যে দর চড়বে তাই বা কে জানে ? অনিশ্চিত আশায় কতদিনই বা বসে খাওয়া জুটবে। প্রহ্লাদ খুব আস্তে ডাকে,—নীরু। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

নীরু চুপ করে।

নীরু। আজ থেকে এক কাজ করনা আমার বাড়ীই চলে আয়। ওই ঘরটায় থাকবি। তুই রাঁধবি ছুজনে খাব।

নীরু অনেকক্ষণ কথা বলে না।

প্রহ্লাদ আবার বলে,—তাই বরং ভাল হবে।

তা হয় না।—ধীরে ধীরে নীরু বলে।

কেন ?

কেন তা ত' তোমার বোঝা উচিত।

ঠিক বুঝতে পারছি না।

তোমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকার পরও গাঁয়ে আর কেউ আমার হাতে জল খাবে ভেবেছ ?

তবে না হয়—থেমে যায় প্রহ্লাদ।

কি ?

বলতে ভয় করে। তুই আবার বকতে স্বরু করবি।

কি শুনি না ?

আচ্ছা, বিয়ে ত' আর একবার করতে পারিস ?

পারি,—কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয় নীরু,—কিন্তু বিয়ে করবার মত মানুষ কোথায় ?

মানুষ একটাও নেই !—আহত হয় প্রহ্লাদ।

তেমনি কঠিন উত্তরই আসে নীরুর কাছ থেকে,—না, একটাও নেই।

প্রহ্লাদ আর কথা বলবার মত কিছু খুঁজে পায় না। বুকটার ভেতর এক অভূতপূর্ব অনুভূতি স্বরু হয়। এক যন্ত্রণা যেন।

নীরু এবার উঠে পড়ে।

প্রহ্লাদ কথা বলে না।

নীরুও কথা না বলেই চলে যায়।

একমুহূর্ত আগেই সমবেদনায় প্রহ্লাদের মন গলে ছিল নীরুর জন্যে। কিন্তু এক মুহূর্তের একটা কথার জবাবে সমস্ত সমবেদনা প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। এত অহংকার। বিয়ে করবার মত মানুষ ও একরামপুরে একটাও খুঁজে পায় নি? এরপর যখন না খেতে পেয়ে পেটের জালায় আসতে হবে প্রহ্লাদের কাছে। তখন প্রহ্লাদ কি করতে পারে। মরুক না খেয়ে। প্রহ্লাদের আর কিছু আসে যায় না। একটা বন্ধনও আজ শেষ হয়ে গেল, এবার নিশ্চিন্তে কোথাও চলে যাওয়া যাবে।

অসহ্য অপমানে প্রহ্লাদের সমস্ত শরীরটা গরম হয়ে ওঠে।

ইচ্ছে হয় এখুনী ছুটে গিয়ে নীরুকে ধরে দুটো ঝাঁকানী দিয়ে দুটো চড় বসিয়ে দিয়ে আসে। নিমকহারাম, মনে নেই যখন খেতে পেতো না তখন প্রহ্লাদ সুতো কাটবার বন্দোবস্ত করে বাঁচিয়েছিল। মনে সেই যে কতবার কত সময়ে প্রহ্লাদের উপর ও অন্যায় রকমের জুলুম করেছে সব ব্যাপারে। সে সব জুলুম কিসের জোরে করেছে? জানতে চায় প্রহ্লাদ।

এত দম্ভ কিসের? রূপের? নীরু কি জানে না যে তার চেয়ে অনেক রূপসী মেয়েকে প্রহ্লাদ ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারত। কেন বিয়ে করেনি। তাও কি জানে না। মা মরে যাবার পর এতদিনের কিসের আসায় প্রহ্লাদ বসে আছে।

এ সব জেনেও এত বড় কথা যদি নীরু বলতে পারে, তবে প্রহ্লাদের আর ভাববাব কিছু নেই।

সব চিন্তা শেষ করে এবার তল্পি গোটাতে হবে।

২৪

রতনমনি তরফদার এবার কুঠিকে একটা উপযুক্ত জবাব দিতে চায়।

বাজারে কোম্পানীর সুতো ছাড়বার একটা প্রতিবাদ না জানান পাপ বলেই মনে হয়েছে ওর।

চোখের সামনে এত বড় অত্যাচার দেখবার মত মূঢ় মন নিয়ে ও সংসারে আসেনি। জমীদার চন্দ্রকান্তর মৃত্যুর পর থেকেই রতনমনি যেন ক্রমাগতঃ দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে চলেছে। এমন করে বেঁচে থাকার সার্থকতা মানুষের নেই বলেই ওর ধারণা।

মনের সুতীব্র প্রতিবাদের প্রকাশ হিসেবে ও একরামপুরের সেরা কাটুনী

নীরজাবালার নামে একখানি পত্র লিখে পাঠায় সমাচার দর্পণে প্রকাশের জন্য। একটু আলোড়ন হোক। একটু চৈতন্য তবু যদি হয়।

চিঠিখানা দৈনিক সমাচারে অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হয়।—

শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়,—

আমার যখন সাড়ে চার গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি। স্বামীর ঘরে ভাসুরের প্রতারণায় আমাকে শ্বশুর ঘরে আসিতে হইয়াছিল। পিতাঠাকুর তখন ছিল না। একটি ছোট ভাইকে লইয়া ছিলাম। দিন আর কাটিতে চাহে না। ক্রমশঃ ভাই লইয়া অন্নাভাবে মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল। তখন বিধাতা এমত বুদ্ধি দিলেন যে তাহাতে আমাদের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। অর্থাৎ আসনা ও চরকার সুতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম। প্রাতঃকালে গৃহকর্ম অর্থাৎ ঝাঁটি পাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম। প্রায় একতোলা সুতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম। রান্না করিয়া দুইটি প্রাণী কিছু গলার্ধকরণ করিয়া সরু টেকো লইয়া বসিতাম। দ্বিপ্রহরে আস্‌না সুতা যাহা কাটিতাম তাহা প্রায় এক তোলা। টাকায় তিন তোলা দরে চরকার সুতা আর দেড় তোলা দরে সরু আস্‌না সুতো তাঁতিরা লইয়া যাইত। যত টাকা আগাম চাহিতাম তাহাই দিত। অন্ন বস্ত্রের উদ্বেগ ছিল না। কয়েক গণ্ডা টাকা জমা হইয়াছিল। দীন দরিদ্রকে কিছু দান ধর্ম্ম করিতেও পারিতাম। কেবল চরকার প্রসাদাৎ এত পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। হাটে বিলাতী সুতা আমদানী হইল। আমাদের কপাল পুড়িল। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও তাঁতিগণ সুতা লয় না। কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বিলাতী সুতা আমদানী হইতেছে। বিলাতী সুতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সুতা হইতে ভাল বটে। তাহার দর ৩।৪৲ টাকা সের। এতাবৎ জানিতাম আমরাই কাঙালী। এক্ষণে বুঝিলাম আমা হইতেও কাঙালিনী বিলাতে আছে। তাহারা যে দুঃখ করিয়া সুতা প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের হাট বাজারে বিক্রয় হয় না বলিয়া এদেশে পাঠাইয়াছে। এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। তাহা না হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অতএব সেখানকার কাটুনীদের মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা

করিলে এদেশে সুতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবে। তাহারা বিবেচনা করুক যে তাহারাও মরিতেছে, আমাদেরও মরিতে হইবে। দুইদিকে সর্ব্বনাশ করিয়া কি সুফল উদয় হইবে।

ইতি

হতভাগিনী নীরজা বালা

সাং একরামপুর।

পত্রখানি সমাচার দর্পণে বেরুল। তখনও জানতে পারেনি রতনমনি। ভেবেছিল সদরে তার বাবা সমাচার দর্পণ নেন, সেখানে গিয়ে দেখবে মাসখানেক পরে চিঠিখানা বেরিয়াছে কিনা। কিন্তু তার আগেই খবর পাওয়া গেল। কোম্পানীর সদর কার্য্যালয়ে দৈনিক সমাচারখানা নিয়ে আলোড়ন উঠল। কোম্পানী থেকে সমাচার দর্পণ অফিস থেকে বার করা হোল ঘুষ দিয়ে চিঠির পাণ্ডুলিপিখানি। তারপর সমাচার আর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেয়া হোল চন্দনডাঙার কুঠিতে। সঙ্গে একটি কড়া নোট। এ ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধান করে সঠিক খবর জানাতে হবে। আর যে এ কাজ করেছে তাকে গুরুতর শাস্তি দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

চিঠিপত্র খুলতে খুলতে স্পুণারের চোখে পড়ে সমাচার আর তার সঙ্গে কড়া চিঠি। আর সঙ্গে সেই পাণ্ডুলিপি। পাইপটা ঠোঁট থেকে পড়ে যাচ্ছিল স্পুণারের। আবার পাইপটা চেপে আরক্তিম মুখে বসে রইল সায়েব। ডেকে পাঠাল রতনকে।

এই কাগজ পত্রগুলো দেখোত' ?

কাগজগুলো হাতে নিয়ে মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেল রতনমনির। একটু বুঝিবা কাঁপছিলও ওর হাত ওই কথাটা লক্ষ্য করে যে যে লোক একাজ করেছে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

কি ব্যাপার বলোত ? কিছু জান ? রতনমনির মুখের দিকে কড়া দৃষ্টি রেখে বললে স্পুণার।

ঠিক ত বলতে পারছি নে স্যার। তবে খোঁজ খবর করে বলবার চেষ্টা কোরব।

কিন্তু এত বড় সাহস ত' একটা কাটুনীর হতে পারে না। এর পেছনে কোন জাঁদরেল লোক আছে। তোমার কি মনে হয়?

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বলে রতন,—এখনও ঠিক করে বলা যায় না স্যার।

কুঠির লোক আছে কি?

থাকতে পারে।

বার করোত' সকলের বাংলা হাতের লেখা। লেখা পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো, কার লেখার সঙ্গে মেলে।

রতনমনির মুখটা আরও সাদা হয়ে যায়।

কাগজগুলো নিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। কি মনে করে স্পূণার রতনমনির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে,—থাক্ ওগুলো এখন আমার কাছেই থাক। দাও।

কাগজগুলো স্পুণারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে যায় রতনমনি।

বিকেলের দিকে শোনে কানাইয়ের মুখে,—বলতে ভয় করে হুজুর, অথচ আপনাকে বলা দরকাব।

কি?—ভয়ে ভয়ে বলে রতনমনি।

অনন্ত ঘোষাল এসেছিল সায়েবের ঘরে।

তাই নাকি? তারপর?

সায়েবকে বলতে শুনলুম আপনার নাম। আপনার হাতের লেখাই নাকি চিঠির সঙ্গে মেলে।

রতনমনি কথা বলতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

আমার বড উপকার করেছিলেন তাই কথাটা আপনাকে জানালাম। পণ্ডিতও বোধহয় অনন্ত ঘোষালের দলে।

হুঁ!—চুপ করে বসে থাকে রতনমনি। বলে কানাইকে,—একটা কাজ করতে পারবে?

বলুন হুজুর।

পণ্ডিতকে এখানে কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারবে ধরো রাত বারোটা পর্য্যন্ত।

পারব।

কানাই চলে যায়।

রতনমনি তখুনি বেরোয়। সোজা চলে আসে পণ্ডিতের বাড়ী। বাড়ীর ভেতর ঢুকে এঘর ওঘর খুঁজে পায় না চন্দ্রাকে। রান্নাঘরে গিয়ে চন্দ্রাকে পায়।

চন্দ্রা রান্না করছিল একমনে।

একটা কথা ছিল।

চমকে ফিরে তাকায় চন্দ্রা,—তুমি এখন ?

ভয় নেই পণ্ডিত এসে পড়বে না। আমারও আর আসা হবে না।

কিছুই বুঝছি না।—রান্নার কড়াটা নামিয়ে চন্দ্রা তাকায় রতনের দিকে,—তোমার মুখটা অমন শুকনো কেন ? কি হয়েছে ?

এক গেলাস জল খাওয়াবে ?

এক গ্লাস জল নিয়ে আসে চন্দ্রা। জলটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলে রতনমনি।

একটু পরে বলে,—কুঠিতে থাকা আর হোল না। আজই চলে যেতে হবে।

আজই ? কেন ?

অপরাধ হয়েছে ? কুঠির নজর ভাল নেই আমার ওপর। আমার অপরাধ কাটুনীদের কথা লিখে জানিয়েছিলাম সবাইকে।

সত্যি কথা বলেছিলে ?

সত্যি কথা বলেছিলাম বলেই ত' অপরাধ গুরুতর।

এখনও যদি সত্যি কথা বলো, কি করবে তোমাকে ওরা ?—চন্দ্রা উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে।

হয়ত মেরেও ফেলতে পারে।—একটু হাসে রতনমনি এতক্ষণে।

চমকে ওঠে চন্দ্রা,—মেরে ফেলবে ?

অসম্ভব নয়।

আজই যাবে তাহলে।

হ্যাঁ, যাব নয় পালাব। ভোর রাতে পালাতে হবে, যেতে ত' এখনি দেবে না। আটক করে ফেলবে।

কিন্তু এমন লুকিয়ে পালাবে প্রতিবাদ না করে।

অবস্থাটা এখন প্রতিবাদ করবার মত নয়।

চন্দ্রা স্থির হয়ে বসে থাকে অনেক্ষন।

আর দেখা হয়ত কখনও হবে না।—একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলে রতন।

কোথায় যাবে?

সদরে নয়। আরও দূরে কোথাও।

বাবার কাছে যাবে না?

এখন না। পরে হয়ত যেতে পারি কখনও।

তোমার বাবার কষ্টটা যে কতখানি হবে, তা বুঝবে না।

তার চেয়েও বেশী কষ্ট বাবার হবে, কোম্পানী যদি আমায় আটক করে।

চুপ করে বসে থাকে।

আরও সময় কাটে। উনুনটা জ্বলে ছাই হয়ে যায়।

চন্দ্রা শুধোয়, তোমাদের পণ্ডিতমশাই কোথায়?

কুঠিতে।

সে কি এখুনী ফিরবে?

না। কুঠিতে এখন তোলপাড় হচ্ছে, তার ফিরতে হয়ত অনেক রাত হবে।

না ফিরতেও পারে কি?

হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

আমার কথা কিছু ভাববার সময় পাওনি বোধ হয়।

একটু থমকে যায় রতনমনি। গম্ভীরকণ্ঠে বলে,—সব সময়ই ভাবি বললে বিশ্বাস করবে?

তুমি চলে যাবে, তারপর আমায় কি করতে বলো?

আমি কিছু জানি না। তোমাকে কিছু বলবার মত সাহস ত' আমায় দাওনি।

যদি অভয় দিই।

তবে বলবো, ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে যেতে পারো।

তোমার সঙ্গে। পালিয়ে।—বজ্রাহত হয় যেন চন্দ্রা,—কি বোলছ তুমি?

এছাড়া আমার বলবার আর কিছু নেই।

কিন্তু এ কি করে হয়—

না হলে যেও না। জোর করবো না।

চন্দ্রা কথা বলে না।

রতনমনি আরও কিছুক্ষণ বসে, বলে,—উঠি।

এখনি উঠবে—ব্যাকুলতার স্পষ্ট প্রকাশ চন্দ্রার চোখে।

আর বসে থেকে কি লাভ। যেতেই যখন হবে,—ওঠে রতনমনি।

চন্দ্রা নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে গম্ভীর চিন্তা করতে করতে বলে,—যাবার আগে আর একবার আসতে পারবে?

কখন?

ঠিক যাবার আগে।

কেন?

আমার একটা জবাব শুনে যাবে না।

আচ্ছা তোমার জবাবের আশায় আসব।

বেরিয়ে আসে রতনমনি।

সোজা কুঠিতে চলে আসে। কুঠিতে তখন সরগোল। স্পুণার হুইস্কির নেশায় আজ যেন চড়ে আছে। ঘনঘন পাইপ টানছে আব ফাইল ঘাঁটছে। অনন্ত ঘোষাল আজ এত রাতেও কুঠিতে। কানাই পণ্ডিত সবাই সন্ত্রস্ত। সিপাই বরকন্দাজ তৈরী। যে কোন হুকুমের জন্যে।

তাহলে মাগীটাকে ধরেই আনা যাক কি বলো ঘোষাল?—স্পুণার শুধোয়।

আমি তাই বলি।

কাকে পাঠাই বলোত? রতনকে পাঠান যাক না।

পণ্ডিতকে পাঠান না স্যার?

পণ্ডিত!—হাঁক দেয় স্পুণার।

হুজুর।—পণ্ডিত কাঁপতে কাঁপতে হাজির।

একরামপুরের নীরজাবালা কাটুনীকে চেনো?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। একনম্বরের বদমাইস মাগী হুজুর

যাও মেয়েটাকে ধরে নিয়ে এসো এখুনী।

একা ত' হুজুর—। খুন করে ফেলবে আমায়।—হাত জোড় করে বলে পণ্ডিত।

আটজন সিপাই নিয়ে যাও। যে বাধা দেবে, তাকেও বেঁধে নিয়ে আসবে। যাও।

আটজন সশস্ত্র সিপাই নিয়ে নাচতে নাচতে চলে পণ্ডিত একরামপুরের দিকে। চাবটে লণ্ঠন নিয়ে আরও দুজন খানসামা চলে আসে পিছনে। বিল পার হয়ে বট পাকুরের সীমানা পার হয়ে যায়। একরামপুরে পৌঁছে যায় দ্রুত পায়ে। সোজা চলে আসে নীরুর ঘরের সামনে। অত সিপাই আর পণ্ডিতকে দেখে গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে দোর বন্ধ করে দেয়। ভীষণ আতংকে বুক কাঁপতে থাকে সকলের। কি ব্যাপার! কুঠির সিপাই! দুর্গা নাম জপ করতে থাকে ওরা। নীরুর ঘরের দোরে ধাক্কা পড়ে।

নীরু ঘুম চোখে দোর খুলেই দেখে সামনে সিপাই।—মাগো!—চীৎকার করে ওঠে নীরু।

বাঁধো শালীকে।—পণ্ডিত লম্বা হুকুম চালায়।

নীরুর হাত বেঁধে কোমরে দড়ি বেঁধে টানে সিপাই।

ওগো আমায় কোথা নিয়ে যাচ্ছ গো! মেরে ফেললে গো!

চুপ নাচ্ছার মাগী। কুঠিতে চল।—মুখের ওপর একটা চড় বসিয়ে দেয় পণ্ডিত। অন্ধকারে সমান্তরাল ভাবে দেখা যায় টাঙিখানা হাতে করে প্রহ্লাদ দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে তার ঘরের বারান্দায়। কি করবে কিছুই।স্থির করতে পারছে না। বেঁধে নিয়ে আসে নীরুকে ওরা কুঠিতে একেবারে স্পুণার আর অনন্ত ঘোষালের সামনে। রতন তার ঘরে গিয়ে জিনিষপত্র গোছাতে থাকে একটা ছোট বাক্সে। শুধু নীরুর তীব্র আর্তনাদ কানে ভেসে আসে। স্পুণার অনন্ত ঘোষালকেই প্রশ্ন করতে ইসারা করে।

ঘোষাল প্রশ্ন করে,—বল মাগী এ চিঠি কে লিখেছে?

চিঠি? কি বলছ গো।

স্পুণার চিঠিখানা এগিয়ে দেয়।

আমি কিছু জানি না। সত্যি বলছি আমি কিছু বুঝছি না তোমাদের কথা।

ন্যাকা মাগী। মেরে হাড় ভেঙ্গে দোব।

স্পুণার আরক্ত চোখে বলে ধীরে,—হাড় ভাঙব না। বলো ঘোষাল যে ষোলজন সিপাইয়ের ঘরে থাকতে হবে তিনরাত।

আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে নীরু।

আমি নেকা জানি না।

তবে কাকে দিয়ে লিখিয়েছিস ?

কাউকে দিয়ে না। কিছু জানি না আমি। পায়ে পড়ি তোমাদের আমায় ছেড়ে দাও। সায়েব তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমার বাপ মা।

চোপ্, হারামজাদী।—বুটের ঠোকর লাগে কাঁধে।

পণ্ডিত বলে,—শালীর আবার এক ঢ্যামনা আছে হুজুর। পেল্লাদ বলে একটা তাঁতি।

প্রহ্লাদ। সেটাকেও ধরে নিয়ে এলে না কেন ? যাও সেটাকেও নিয়ে এসো।

নীরু কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ে,—তোমাদের পায়ে পড়ি তাকে এনো না। তার কোন দোষ নেই।

যাও নিয়ে এসো প্রহ্লাদকে।

না তাকে এনো না। তোমার যা খুসী করো। তাকে এনো না।

কুঠির দেওয়ালের খুপরীর পাশ থেকে টাঙি হাতে একটা ছায়া মূর্তিকে কেঁপে উঠতে দেখা যায় তখন।

তবে বল এ চিঠি কার লেখা ?

আমার লেখা।—স্থির কণ্ঠে বলে নীরু।

কেন লিখেছিলি ?

জানি না।

কাকে দিয়ে লিখিয়েছিস ?

বলব না !

সিপাই ঘরে পাঠাব তবে ?

পাঠাও।

এ্যাই সিপাই ঘরে দিয়ে এসো। এক রাত।

তুজন খানসামা ধরে নিয়ে যায় নীরুকে। কঠিন স্তব্ধ চোখে নীরু বাইরে আসে। চারটে সিপাই মুহূর্তে এসে নীরুকে যেন লুফে নিয়ে চলে যায়।

সিপাইদের ঘরে নীরুর আর্তনাদ শুনতে শুনতে হাতে তুড়ি দিতে দিতে আপন মনে হাসতে হাসতে গভীর রাত্রে পণ্ডিত বাড়ীর দিকে চলে। নিস্তব্ধ সড়কে তু-একটা শেয়াল কুকুরের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তবু মনের আনন্দে চলেছে পণ্ডিত। চন্দ্রাকে গল্পটা বলতে হবে।

ঘরে পৌঁছয়। শোবার ঘরে গিয়ে অন্ধকারে বলে,—কই গো। অন্ধকারে দোর খুলে শুয়ে আছো। আচ্ছা মেয়েমানুষ! ভয়ও নেই। সিপাই টেপাই যদি এসে পড়ে। বলে নিজের মনেই হাসে পণ্ডিত।

কি হোল ওঠো,—বিছনার উদ্দেশ্য অন্ধকারে বলে পণ্ডিত।—কই ওঠো। কিছু খেতে দাও। কোন সাড়া নেই চন্দ্রার।

আলোটা জ্বালে পণ্ডিত। বিছানা ত শূন্য—। চন্দ্রা ত' নেই!

বাইরের ঘরে আলো নিয়ে যায়। বাইরের ঘরেও নেই।

রান্নাঘরে? নেই।

চন্দ্রা কোথায় গেল '

বিশুষ্ক মুখে ডাকে পণ্ডিত, চন্দ্রা,—ছোট বৌ!

পাতকুয়োর ধারে এখানে সেখানে কোথাও নেই।

কোথায় গেল। রাগে মাথায় আগুন জ্বলতে থাকে পণ্ডিতের। আসুক আজ। দেখাবে সে মজা। নীরুর মত মেয়েকে থাবড়ে ঠিক করে দিয়ে এলো আর চন্দ্রাকে পারবে না! দেখবে আজ শাস্তি বলে কাকে!

শোবার ঘরে এসে কোনের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যায় পণ্ডিত। বাক্স খোলা। বাক্সের সামনে একটা বাঁশের বাঁশী ভাঙা পড়ে আছে।

ভাঙা বাঁশীটা তুলে নিয়ে চিনতে একটুও দেরী হয় না পণ্ডিতের। বাঁশীটা ছোটবাবু—রতনমনির। ছোটবাবুর বাঁশী এ ঘরে।

বাক্স ভাঙা! বুঝতে আর দেরী হয় না। গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে পণ্ডিত।

শেষরাতে অন্ধকার কেটে আসছে। জলজ্বলে নক্ষত্রগুলো নীল আকাশে পাণ্ডুর হয়ে আসছে। চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে আমলকি গাছের ডগায়। কুঠির সামনে দুজন সিপাই এসে একটা দেহ ফেলে রেখে কুঠির ভেতর চলে যায়।

দেহটা অসাড় হয়ে পড়ে থাকে।

কুঠির দেয়ালের পাশ থেকে টাঙি হাতে এগিয়ে আসে প্রহ্লাদ। ভররাত সে বসেছিল বাইরে। নীরু আর স্পুণারের কথা সব শুনেছে, সব দেখেছে, তবু চুপ করেই বসেছিল। নীরুর বারণ ছিল হঠাৎ কিছু করে বোস না।

ধীরে ধীরে এসে দেহটাকে তুলে নিয়ে খানিকটা দুরে একটা পুকুরের ধারে আসে। সংজ্ঞা হীন দেহটাকে শুইয়ে দিয়ে পুকুরের জল এসে চোখে মুখে দিতে থাকে। মাথায় চোখে মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান ফিরে আসে নীরুর। অসহ্য যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে ওঠে ও।

নীরু।—আস্তে ডাকে প্রহ্লাদ।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে নীরু চোখ মেলে,—কে?

আমি, কালো।—বলে প্রহ্লাদ।

নীরুর মাথাটা বুকে নিয়ে বাঁ হাতের ওপর রেখে প্রহ্লাদ ওর চুলগুলো ঠিক করে দেয়।

নীরু মাথাটা সরিয়ে নেবায় চেষ্টা করে,—আমাকে ছুঁয়ো না কালো। এখানেই ফেলে রেখে চলে যাও।

কেন?

আমার যে জাত গেছে।—বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কাঁদে নীরু।

জাত আমাদের সকলেরই গেছেরে! দাসখত যেদিন দিয়েছি, সেদিনই গেছে।

নীরু ওর হাতের ওপর মুখ রেখে কাঁদে। কাঁদতে দেয় প্রহ্লাদ ওকে অনেকক্ষণ। রাত প্রায় ভোর হয়ে এলো।

প্রহ্লাদ বলে,—আর দেরী নয় নীরু। একটু যদি আস্তে আস্তে হাঁটতে পারিস। তবে চল আজকেই গাঁ পার হয়ে চলে যাই।—

আমাকে সঙ্গে নেবে?

প্রহ্লাদ ওর কথার উত্তর না দিয়ে ওকে ধরে ধরে উঠে দাঁড় করায়। নিজের কাঁধে ওর হাতখানা টেনে নিয়ে অতি ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

চলতে চলতে চন্দন ডাঙা ছাড়িয়ে একরামপুরের সীমানাও পার হয়ে আসে।

পিছন ফিরে তাকায় প্রহ্লাদ একরামপুরের দিকে। একটু হাসে।

নীরু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় ওর দিকে।

খুব শান্ত স্বরে বলে প্রহ্লাদ,—জানিস্, কাল রাতে তাঁতখানা পুড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আজ লোকে গিয়ে দেখবে ছাই পড়ে আছে।

নীরু ওর দিকে তাকায়, তারপব কাপডখানা দেহে ভাল কবে জড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে,—চলো!

সামনের সড়ক ধরে এগিয়ে চলে ওরা একরামপুরকে পিছনে ফেলে।

শেষ